সহায়ক পাঠ

কোনি

মতি নন্দী

বাংলা । প্রথম ভাষা

দশম শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর, ২০১৫

দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৬

তৃতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : সুব্রত মাজী

প্রকাশক

অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি

সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

77/2, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-700 016

মুদ্রক

ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সট বুক কর্পোরেশন লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)

কলকাতা-৭০০ ০৫৬

এই পুস্তকটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আর্থিক আনুকূল্যে কেবলমাত্র সরকারি, সরকার পোষিত ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে গঠিত 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি মাধ্যমিক স্তরে ২০১৫ সালের নতুন শিক্ষাবর্ষে বলবৎ করতে আমরা সচেষ্ট হয়েছি। সেই সূত্রে দশম শ্রেণির 'সাহিত্য সঞ্চয়ন'-এর সহায়ক পাঠ্যপুস্তক হিসেবে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে গৃহীত হয়েছে মতি নন্দীর 'কোনি' উপন্যাসটি। অভিনব এই উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড.পার্থ চ্যাটার্জীকে কৃতজ্ঞতা জানাই। শিল্পী সুব্রত মাজী বইটির আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ ও অলংকরণ করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। রূপায়ণের ক্ষেত্রে 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র সক্রিয়তা উল্লেখযোগ্য। তাঁদের ধন্যবাদ। আশা করা যায়, 'কোনি' উপন্যাসটি শিক্ষার্থীদের সমাদর পাবে। বইটির উৎকর্ষবৃদ্ধি-র জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

ডিসেম্বর ২০১৭
৭৭/২, পার্ক স্ট্রিট,
কলকাতা-৭০০ ০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

মতি নন্দী (১৯৩১ — ২০১০)

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক। জন্ম ১৯৩১ সালে, উত্তর কলকাতায়। খেলাধূলার সঙ্গে আশৈশব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজে বাংলা সাম্মানিকের ছাত্র ছিলেন। ১৯৫৭ সালে 'দেশ' পত্রিকায় প্রথম গল্প প্রকাশিত হয়। ১৯৫৮ সালে 'শারদীয় পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর গল্প 'বেহুলার ভেলা' পাঠক মহলে সাড়া ফেলেছিল। পরবর্তীকালে বড়োদের জন্য এবং শিশু-কিশোরদের জন্য সমান দক্ষতায় গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। বাংলা 'ক্রীড়াসাহিত্য' তাঁর হাতেই প্রাণ পেয়েছে। নিজস্ব ভাষাভঙ্গী, তীব্র বিদ্রূপ আর অবিস্মরণীয় শিল্পদৃষ্টি তাঁর রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। শিশু-কিশোরদের জন্য বহু জনপ্রিয় গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে 'স্ট্রাইকার', 'স্টপার', 'কোনি', 'ননীদা নট আউট', 'অপরাজিত আনন্দ', 'কলাবতী', 'শিবা' প্রভৃতি সাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছে। ১৯৭৪ সালের আনন্দ পুরস্কার, ১৯৯১ সালে 'সাদা খাম' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন। শিশু-কিশোর সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য পেয়েছেন বাংলা আকাদেমি পুরস্কার (২০০০)। তাঁর মতো সব্যসাচী লেখকের জুড়ি বিশ্বসাহিত্যে মেলা ভার।

মতি নন্দী
২ বিধান শিশু সরণি • স্কাইলাইন • ফ্ল্যাট নং ৪০৫
কলকাতা ৭০০ ০৫৪

সূচনা-কথা

মতি নন্দীর ‘কোনি’ নিম্ন-মধ্যবিত্ত মেয়ের কাহিনি। এতে আছে একটি মেয়ের নিরলস অধ্যবসায় ও সমস্যার সাথে মোকাবিলা করে নিজের উত্তরণ। লড়াই করে জিতে যাওয়া। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ এবং পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এই বইটিকে দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন শুনে আমি খুবই আনন্দিত। আমি এবং আমার পরিবারের সকলের কাছেই এটি খুশির বার্তা নিয়ে এসেছে।

ধন্যবাদান্তে,

১০ জুলাই ২০১৫

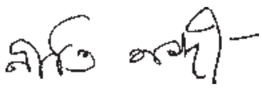

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

ঋত্বিক মল্লিক সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় রুদ্রশেখর সাহা

ইলোরা ঘোষ মির্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

সুব্রত মাজী

পুস্তক নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল

আজ বারুণী। গঙ্গায় আজ কাঁচা আমের ছড়াছড়ি।

ঘাটে থই থই ভিড়। বয়স্কদের ভিড়টাই বেশি। সদ্য ওঠা কাঁচা আম মাথার উপর ধরে, ডুব দিয়ে উঠেই ফেলে দিচ্ছে। ভেসে যাচ্ছে আম। কেউবা দূ রে ছুড়ে ফেলছে।

ছোটো ছোটো দলে ছেলেরা জলে অপেক্ষা করে আছে আম সংগ্রহের জন্য। কেউ গলাজলে দাঁড়িয়ে,কেউবা দূরে ভেসে রয়েছে। আম দেখলেই হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। একসঙ্গে দু-তিনজন চিৎকার করতে করতে জল তোলপাড় করে এগিয়ে যায়। যে পায়, প্যান্টের পকেটে রেখে দেয়, পকেটটা আমে ভরে গিয়ে ফুলে উঠলে জল থেকে উঠে ঘাটের কোথাও রেখে আসে। সেই আমে হাত দেওয়ার সাধ্য কারোর নেই। পরে আমগুলো ওরা বিক্রি করে পথের ধারে বসা বাজারে, অনেক কম দামে।

আজ গঙ্গায় ভাটা, জল অনেকটা সরে গেছে ঘাট থেকে। সিঁড়ি এবং তার দু-ধারে ইটবাঁধানো ঢালু পাড় শেষ হয়ে কিছুটা পলিমাটি, তারপর জল। স্নান করে কাদা মাড়িয়ে বিরক্ত মুখে উঠে আসতে হচ্ছে। তারপর অনেকে যায় ঘাটের মাথায়, ট্রেন লাইনের দিকে মুখ করে বসা বামুনদের কাছে, যারা পয়সা নিয়ে জামাকাপড় জমা রাখে, গায়ে মাখার সরষে বা নারকোল তেল দেয় এবং কপালে চন্দনের ছাপ আঁকে। রাস্তার একধারে বসা ভিখারিদের অনেকে উপেক্ষা করে, কেউ কেউ করে না। দু-ধারের ছোটো ছোটো নানান দেবদেবীর দুয়ারে এবং শিবলিঙ্গের মাথায় ঘটি থেকে গঙ্গাজল দিতে দিতে, কাঠের, প্লাস্টিকের, লোহার, খেলনার ও সাংসারিক সামগ্রীর দোকানগুলির দিকে কৌতূহলী চোখ রেখে অধিকাংশই বাড়ির দিকে এগোবে। পথের বাজার থেকে ওল বা থোড় বা কলম্বা লেবু ধরনের কিছু হয়তো কিনলেও কিনতে পারে। তারপর, রোদে তেতে ওঠা রাস্তায় খালি-পা দ্রুত ফেলে বাড়ি পৌঁছাবে বিরক্ত মেজাজে।

তেলচিটে একটা ছেঁড়া মাদুরে উপুড় হয়ে বিষ্টুচরণ ধরও দলাই-মালাই করাতে করাতে বিরক্ত মুখে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে। বিষ্টু ধর (পাড়ায় বেষ্টাদা) আই. এ. পাশ, অত্যন্ত বনেদি বংশের, খান সাতেক বাড়ি ও বড়োবাজারে ঝাড়ন মশলার কারবার এবং সর্বোপরি সাড়ে তিন মণ একটি দেহের মালিক। ওরই সমবয়সি চল্লিশ বছরের একটি বিশ্বস্ত অস্টিন সর্বত্র ওকে বহন করে।

বিষ্টু ধরের বিরক্তির কারণ হাত পনেরো দূরের একটা লোক। পরনে সাদা লুঙ্গি আর গেরুয়া পাঞ্জাবি, কাঁধে রঙিন ঝোলা। তার দিকে পিট পিট করে তাকাচ্ছে আর মাঝে মাঝে মুচকি হাসছে। বিষ্টু বুঝতে পেরেছে, লোকটা হাসছে তার দেহের আয়তন দেখে। এরকম হাসি, বাচ্চা ছেলেরাও হাসে। বিষ্টু তখন দুঃখ পায়, তার ইচ্ছা করে ছিপছিপে হতে।

কিন্তু বিষ্টু বিরক্ত হচ্ছে যেহেতু এই লোকটা মোটেই বাচ্চা নয়। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। নুন আর গোলমরিচের গুঁড়ো মেশালে যেমন দেখায়, মাথার কদমছাঁট চুল সেই রঙের। বয়সটা পঞ্চাশের এধারে বা ওধারে বছর পাঁচেকের মধ্যে হতে পারে। লোকটার গায়ের রং ধুলোমাখা পোড়ামাটির মতো; আর চোখের চাহনি! ধূসর মণি দুটো দেখলে মনে হবে বোধহয় সূর্যের

দিকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে তাকিয়ে থেকেই মণির কালো রংটা ফিকে হয়ে গেছে। চাহনিটা এমন, দেখলে মনে হয় যেন তার মনের সঙ্গে মেলে না সেইসব ব্যাপারগুলো ব্লোটর্চের মতো পুড়িয়ে দিয়ে ভিতরে সেঁধিয়ে যাবে। চোয়াল দুটোকে শক্ত করে ধরে আছে জেদ।

মালিশওলা ডান হাঁটুটা বিষ্টুর কোমরে চেপে ধরে মেরুদণ্ড বরাবর ঘাড় পর্যন্ত দ্রুত ওঠানামা করাতে লাগল পিস্টনের মতো। বার দশেক এইভাবে হাঁটু ব্যবহারের পর মালিশওলা নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতের তালু জোড়া করে বিষ্টুর পিঠে জোড়াতালুর কোদাল চালাল।

এরপর বিষ্টু চিত হবার চেষ্টা করল। পারছিল না, মালিশওলা ঠেলেঠুলে গড়িয়ে দিতেই সে অভীষ্ট লাভ করল। আব্রুরক্ষাকারী গামছাটি ঠিকঠাক করে বিষ্টু গম্ভীর স্বরে নির্দেশ দিল, ‘‘তানপুরো ছাড়।’’

মালিশওলা দশ আঙুল দিয়ে বিষ্টুর সারা শরীরের চর্বিগুলো খপাখপ খামচে টেনে টেনে ধরে ছেড়ে দিতে লাগল।

‘‘তবলা বাজা।’’

মালিশওলা দশ আঙুল দিয়ে বিষ্টুর গলা থেকে কোমর অবধি ধপাধপ চাঁটাতে শুরু করল। চোখ বুঁজে প্রবল আরামে নিশ্বাস ফেলতে গিয়ে তার মনে হলো, লোকটা নিশ্চয় এখন ফ্যাকফ্যাক করে হাসছে। বিষ্টু তখন খুবই বিরক্ত বোধ করে বলল, ‘‘সারেগামা কর।’’

মালিশওলা নির্দেশ পেয়েই আঙুলগুলো দিয়ে হারমোনিয়াম বাজাতে লাগল বিষ্টুর সর্বাঙ্গে। আঙুলগুলো শরীরে কিলবিল করায় সুড়সুড়ি লাগছিল এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় চর্বি থলথল করে কেঁপে উঠতেই বিষ্টু শুনল খুকখুক হাসির শব্দ।

চিত হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিষ্টু বলল, ‘‘এতে হাসির কী আছে, য়্যা?’’

সেকেন্ড কুড়ি পরে বিষ্টু জবাব শুনল, ‘‘ম্যাসেজ হচ্ছে না সংগীতচর্চা হচ্ছে?’’

‘‘যাই হোক না, তাতে আপনার কী?’’

‘‘ব্লাডপ্রেশারটার মেপেছেন?’’

‘‘আপনার দরকার?’’

‘‘ব্লাড সুগার পরীক্ষা করিয়েছেন? কোলেস্টেরল লেভেলটাও দেখেছেন কি?’’

‘‘কে মশাই আপনি, গায়ে পড়ে এত কথা বলছেন। চান করতে এসেছেন, করে চলে যান।’’

‘‘তা যাচ্ছি। তবে আপনার হার্টটা বোধহয় আর বেশিদিন এই গন্ধমাদন টানতে পারবে না।’’

‘‘কী বললেন!’’

বিষ্টু ধর উঠে বসার জন্য প্রথমে কাত হয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথাটি তুলল। তারপর দু-হাতে মেঝেয় চাপ দিয়ে উঠে বসল।

লোকটি কাঁচুমাচু হয়ে বলল, ‘‘অবশ্য হাতি কিংবা হিপোর কখনো করোনারি অ্যাটাক হয়েছে বলে শুনিনি, সুতরাং আমি হয়তো ভুলও বলতে পারি।’’

বিষ্টু ধর রাগে কথা বলতে পারছে না, শুধু চোখ দিয়ে কামান দাগতে লাগল। লোকটি পাঞ্জাবি খুলল। লুঙ্গি খুলল। ভিতরে হাফ প্যান্ট।

অবশেষে বিষ্টু ধর কোনোক্রমে বলল, ‘‘আপনাকে যে কী বলব ভেবে পাচ্ছি না।’’

‘‘আমার বউ ঠিক এই কথাই বলে।’’

‘‘আপনি একটা ন্যুইসেন্স।’’

‘‘আমার ক্লাবের অনেকে তাই বলে।’’

‘‘আপনার মতো লোককে চাবকে লাল করা উচিত।’’

লোকটি আবার ছেলেমানুষের মতো পিটপিট করে তাকাল।

‘‘আচ্ছা, আমি যদি আপনার মাথায় চাঁটি মারি, আপনি দৌড়ে আমায় ধরতে পারবেন?’’

কথাগুলো বলেই লোকটি এক জায়গায় দাঁড়িয়েই ছোটার ভঙ্গিতে জগিং শুরু করল। অনেকে তাকাল, অনেকে ভাবল পাগল।

বিষ্টু হতভম্ভ হয়ে লোকটির জগ করা দেখতে লাগল। চাঁটি মারার ভঙ্গিতে হাতটা তুলে লোকটি হঠাৎ বিষ্টুর দিকে ছুটে এল। বিষ্টু ডুব দেওয়ার মতো মাথাটা নীচু করল। লোকটি হাত তুলে রেখেই পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল।

‘‘পারবেন ধরতে যদি চাঁটিয়ে যাই? আমার কিন্তু আপনার থেকে অনেক বয়েস।’’

জগ করতে করতে লোকটি আবার এগিয়ে আসছে। বিষ্টু ধর বুনো মোষের মতো তেড়েফুঁড়ে উঠে দাঁড়াল। তাইতে লোকটি দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপর নাচের ভঙ্গিতে শরীরটাকে পেন্ডুলামের মতো ডাইনে এবং বামে দুলিয়ে তিড়িং তিড়িং লাফালাফি শুরু করল। বিষ্টু থাবার মতো দুটো হাত তুলে অপেক্ষা করছে। দৃশ্যটা অনেককে আকৃষ্ট করল।

‘‘আমি রোজ একসারসাইজ করি। আইসোমেট্রিক, ক্যালিসথেনিক, বারবেল, বুঝলেন রোজ করি। দারুণ খিদে পায়। আপনার পায়?’’

বিষ্টু ধর কথা না বলে শুধু ‘ঘোঁৎ’ ধরনের একটা শব্দ করল।

‘‘খিদের মুখে যা পাই তাই অমৃতের মতো লাগে। এই সুখ আপনার আছে?’’

উত্তরের অপক্ষো না করেই লোকটি জগ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে শেষ ধাপ পর্যন্ত গিয়ে আবার উঠে এল।

তিনবার এইভাবে ওঠানামা করে সে বিষ্টু ধরের পাঁচ গজ তফাতে দাঁড়িয়ে হাঁফাতে লাগল। হাত দুটো নামিয়ে বিষ্টু তখন খানিকটা দিশাহারার মতোই লোকটির কাণ্ড দেখছিল। ওর চোখে এখন রাগের বদলে কৌতূহল। মনে মনে সে ছিপছিপে শরীরটার সঙ্গে নিজের স্থূলত্ব বদলাবদলি করতে শুরু করে দিয়েছে।

‘‘খাওয়ায় আমার লোভ নেই। ডায়েটিং করি।’’ ভারিক্কি চালে বিষ্টু ধর ঘোষণা করল এবং গলার স্বরে বোঝা গেল এর জন্য সে গর্বিত।

লোকটি দু’পা এগিয়ে এসে বলল, ‘‘কী রকম ডায়েটিং!’’

‘‘আগে রোজ আধ কিলো ক্ষীর খেতুম, এখন তিনশো গ্রাম খাই; জলখাবারে কুড়িটা নুচি খেতুম এখন পনেরোটা; ভাত খাই মেপে আড়াইশো গ্রাম চালের; রাতে রুটি বারোখানা। ঘি খাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছি গরম ভাতের সঙ্গে চার চামচের একবিন্দুও বেশি নয়। বিকেলে দু-গ্লাস মিছরির সরবত আর চারটে কড়াপাক। মাছ-মাংস ছুঁই না, বাড়িতে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ আছে। আর হপ্তায় একদিন ম্যাসেজ করাই এখানে এসে। আমার অত নোলা নেই, বুঝলেন সংযম কেচ্ছাসাধন আমি পারি। হার্টের ব্যামো-ফ্যামো আমার হবে না, বংশের কারো হয়নি। বাজি ফেলে সত্তরটা ফুলুরি খেয়ে কলেরায় বাবা মারা গেছে, জ্যাঠা গেছে অম্বলে।’’

‘‘এত কেচ্ছাসাধন করেন! বাঁচবেন কী করে?’’

লোকটি এগিয়ে এসে বিষ্টু ধরের ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে দিল।

‘‘আঃ, সুড়সুড়ি লাগে,’’ বিষ্টু হাতটা সরিয়ে দিয়ে ক্ষুণ্ণস্বরে বলল, ‘‘আমার বউ ওই কথা বলে। সকাল থেকে রাত অবধি ব্যবসা দেখি। সরষে, চিনি, ডাল নানান জিনিসের কারবার। এত খাটুনির পর এইটুকু খাদ্য! তারপর এই অপমান।’’

‘‘কে করল?’’

লোকটি আবার হাত বাড়াতেই বিষ্টু এক পা পিছিয়ে বলল,

‘‘না, সুড়সুড়ি লাগে।’’

‘‘ কে অপমান করল?’’

"কেন, আপনি হাতি-হিপো বললেন না! জলহস্তির ইংরিজি হিপো তা কি আমি জানি না, আমি কি অশিক্ষিত?"

"না না, আমি আপনাকে অশিক্ষিত তো বলিনি।" লোকটি বিব্রত হয়ে চশমা মুছতে মুছতে বলল, "আপনার ওজনটা খুব বিপজ্জনক হার্টের পক্ষে।"

"বিপজ্জনক মানে?" বিষ্টু ধর তাচ্ছিল্য প্রকাশের চেষ্টা করল, কিন্তু গলা দিয়ে বেরিয়ে এল ভয়ার্ত স্বর। "আমি কি মরে যেতে পারি!"

"তা পারেন। আর নয়তো কেচ্ছাসাধনের কষ্ট করতে করতে, রোগে ভুগে ভুগে বেঁচে থাকবেন কয়েকটা বছর।"

বলেই লোকটি দু-হাত তুলে সামনে ঝুঁকে পিঠটা ধনুকের মতো বেঁকাল। হাতের আঙুল পায়ে ছুঁইয়ে আবার সিধে হলো।

"আপনি আমার থেকে চার হাজার গুণ বড়োলোক, কিন্তু চার লক্ষ টাকা খরচ করেও আপনি নিজে শরীরটাকে চাকর বানাতে পারবেন না।"

"কী রকম! কী রকম!"

লোকটি তার ডান কনুই শরীরে লাগিয়ে পিস্তল ধরার মতো হাতটা সামনে বাড়াল।

"এইবার আমার হাতটা নামান তো।"

অবিশ্বাসভরে বিষ্টু ধর হাতটার দিকে তাকাল। শিরা উপশিরা গাঁটসমেত হাতটাকে শুকনো শিকড়ের মতো দেখাচ্ছে।

"নামান নামান।"

ফুলো ফুলো আঙুল দিয়ে বিষ্টু লোকটার কবজি চেপে ধরে নীচের দিকে চাপ দিল। নড়ল না এক সেন্টিমিটারও। ঠোঁট কামড়ে বিষ্টু জোরে চাপ দিল। হাতটা একই জায়গায় রয়েছে। বিষ্টু এবার সর্বশক্তি প্রয়োগ করল। কপালে ঘাম ফুটছে। কিছু লোক দাঁড়িয়ে দেখছে। তাদের চোখে বিস্ময়, লোকটার সাফল্যে না বিষ্টুর ব্যর্থতায় বোঝা যাচ্ছে না। বিষ্টু লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে পাতলা হাসি আর চোখ পিটপিটানি দেখতে পেল। হাতটা সে নীচে নামাতে পারছে না। বিষ্টু হাল ছেড়ে দিয়ে ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলতে লাগল।

"কী করে পারলেন!"

"জোরে বলতে শুধু গায়ের জোরই বোঝায় না। মনের জোরেই সব হয়। ইচ্ছাশক্তি দিয়ে শরীরের দুর্বলতা ঢাকা দেওয়া যায়। শরীর যতটা করতে পারে ভাবে, তার থেকেও শরীরকে দিয়ে বেশি করাতে পারে ইচ্ছার জোর। সেজন্য শুধু শরীর গড়লেই হয় না, মনকেও গড়তে হয়। শরীরকে হুকুম দিয়ে মন কাজ করাবে। আপনার মন হুকুম করতে জানে না তাই শরীর পারল না।"

বিষ্টু ধর বিষণ্ণ চোখে তাকিয়ে থেকে বিড় বিড় করে বলল, "ইচ্ছে করে খুব রোগা হয়ে যাই।"

ঠিক এই সময়ই গঙ্গার তীর থেকে তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এল, "কো ও ও ও ... নি ই ই ই। কো ও ও ও... নি ই ই ই।"

লোকটি গঙ্গার দিকে তাকাল।

গঙ্গায় একটা আম ভেসে চলেছে ভাটার টানে। তিনজন সাঁতরাচ্ছে সেটাকে পাবার জন্য। কোমর জলে দাঁড়িয়ে দু-তিনটি বছর চোদ্দো-পনেরোর ছেলে জল থাবড়ে হইচই করে ওদের তাতিয়ে তুলছে। সমানে-সমানে ওরা যাচ্ছে মাথা তিনটে দু-ধারে নাড়াতে নাড়াতে, কনুই না ভেঙে সোজা হাত বৈঠার মতো চালিয়ে ওরা আমটাকে তাড়া করেছে।

হঠাৎ ওদের একজন একটু একটু করে এগিয়ে যেতে শুরু করল, অন্য দু-জনকে পিছনে ফেলে। তখনই চিৎকার উঠল — ‘‘কো ও ও ও...নি ই ই ই। কো ও ও ও...নি ই ই ই।’’ পিছিয়ে পড়া দু-জনও গতি বাড়াল।

আমটা প্রায় প্রথম ছেলেটির মুঠোয় এসে গেছে। হঠাৎ সে থমকে গেল। হাত ছুড়ছে কিন্তু এগোল না। বার দুয়েক তার মাথাটা জলে ডুবল। তারপর সে রাগে চিৎকার করে ঘুরে গিয়ে লাথি ছুড়ল।

ততক্ষণে পিছন থেকে একজন ওকে অতিক্রম করে আমটা ধরে ফেলেছে।

‘‘পা টেনে ধরেছিল।’’ বিষ্টু ধর বলল।

লোকটি হেসে চশমাটা খুলে ঝোলায় রাখল। ঘাটের বাইরের দিকে সেখানে কয়েকজন উড়িয়া ব্রাহ্মণদের একজনের কাছে ঝোলাটা রেখে এসে, লোকটি অতি সাবধানে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। চশমা ছাড়া, মনে হচ্ছে, লোকটি যেন অন্ধ।

জলের কিনারে কাদার উপর তখন মারামারি হচ্ছে, একজনের সঙ্গে দু-জনের। কাদা ছিটকোচ্ছে। লোকেরা বিরক্ত হয়ে গজগজ করতে করতে সরে গেল। দু-তিনটি ছেলে ওদের চারপাশে ঘুরে ঘুরে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে।

‘‘ঠিক হ্যায়, চালা, আরো জোরে।’’

পা থেকে মাথার চুল কাদায় লেপা কঞ্চির মতো সরু চেহারাটা তার লম্বা হাত দুটো এলোপাথাড়ি ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরাচ্ছে। অন্য দুজন সেই বিপজ্জনক বৃত্তের বাইরে কুঁজো হয়ে তাক খুঁজছে।

‘‘ফাইট কোনি ফাইট। চালিয়ে যা বক্সিং।’’

দু-জনের একজন পিছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর উপর। পড়ে গেল দু-জনেই।

‘‘অ্যাই অ্যাই ভাদু, চুল টানবি না কোনির। তাহলে কিন্তু আমরা আর চুপ করে থাকব না।’’

কোনির পিঠের ওপর বসা ভাদু চুল ছেড়ে দিয়ে দু-হাতে কোনির মাথা ধরে, কাদায় মুখটা ঘষে দেবার চেষ্টা করতে লাগল। কোনি পা ছুড়ল।

কোমরে চাড় দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করল। তারপর ঝটকা দিয়ে ভাদুর ডান হাতটা মুখের কাছে টেনে নিয়ে এসে কামড়ে ধরল দুটো আঙুল।

চিৎকার করে ভাদু লাফিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে কোনি উঠে দাঁড়িয়ে ভাদুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

‘‘খুবলে নোব তোর চোখ, বার কর আম। আমাকে চোবানো! পুঁতে রাখব তোকে এই গঙ্গামাটিতে। হয় আম দিবি নয় চোখ নোব।’’

দু-হাতের দশটা আঙুল ইগলের নখের মতো বেঁকিয়ে চিত হয়ে পড়া ভাদুর চোখের সামনে কোনি এগিয়ে আনতেই, দু'টি ছেলে ওকে ঠেলে সরিয়ে আনল।

''ছেড়ে দে চণ্ডু, হাত ছাড় কান্তি। শোধ নিয়ে ছাড়ব। আমাকে চোবানো?''

কোনির ঠোঁটের কোণে ফেনা, সামনের দাঁত হিংস্রভাবে বেরিয়ে রয়েছে। হিলহিলে লম্বা দেহটা সামনে-পিছনে দুলছে কেউটের ফণার মতো।

''এই ভাদু ও আম কোনির। বার করে দে। নয়তো সত্যিই চোখ তুলে নেবে কিন্তু।''

ভাদু ডান হাতটা চোখের সামনে ধরে দেখছিল। শিউরে উঠে বলল, ''রক্ত বেরোচ্ছে! দাঁত বসিয়ে গত্তো করে দিয়েছে।''

কোনির হাত ছেড়ে দিয়ে কান্তি এগিয়ে এসে ভাদুর প্যান্টের পকেটে হাত ঢোকাল। কয়েকটা কাঁচা আম বার করে, বড়োটি বেছে নিয়ে কোনির দিকে ছুড়ে দিল।

লুফে নিয়েই কোনি কামড় বসাল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিকৃত মুখে বলল, ''কী টক রে বাবা। মা গঙ্গাকে এমন আমও খেতে দেয়!''

আমটা জলে ছুড়ে দিয়ে সে মুখ থেকে ছিবড়ে ফেলতে ফেলতে ভাদুর কাছে এলো।

''দেখি তো কেমন গত্তো হয়েছে।''

খপ করে ভাদুর হাতটা ধরে সে ভ্রূ কুঁচকে আঙুলটা তুলে দেখল।

''ভাগ্, কিচ্ছু হয়নি। নাম্ নাম্ জলে নাম্। যেমন কাজ করেছিস তেমনি ফল পেয়েছিস। আমাকে রাগালে কী হয়, এবার বুঝলি তো।''

কয়েকটি ডুব দিয়ে লোকটি কোমরজলে দাঁড়িয়ে গামছা ঘষছিল পিঠে। কানে এল পাশের এক বৃদ্ধের আপনমনের গজগজানি।

''জ্বালিয়ে মারে হতভাগারা। গঙ্গার ঘাটটাকে নোংরা করে রেখেছে হাঘরে হাভাতের দল। মা গঙ্গাকে উচ্ছুগ্গো করা আমই রাস্তায় বসে বেচবে। জুটেছে আবার এক মেয়েমদ্দানি বাপ-মাও কিছু বলে না।''

লোকটি আবার ডুব দিতে যাচ্ছিল, থেমে গিয়ে বৃদ্ধের দিকে তাকাল।

''মেয়েমদ্দানিটা কে!''

''কে আবার দেখতে পাননি, চোখ তো একজোড়া রয়েছে।''

লোকটি মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাল। চশমাছাড়া ঝাপসাভাবে দেখল, ভাদুর হাত ধরে কোনি টানাটানি করছে। কাদামাখা কোনির মধ্য দিয়ে এক একবার একটি মেয়ে ফুটে ফুটে উঠছে যেন। ঘাড় পর্যন্ত ছাঁটা কাদামাখা চুল মাথায় বসে। প্যান্টে গোঁজা গেঞ্জি শরীরের সঙ্গে লেপটে দ্বিতীয় পরত চামড়া হয়ে আছে। দীর্ঘ সরু দেহ। সরু পা, সরু হাত। লোকটি ঠাওর করতে পারছে না, কোনি ছেলে কী মেয়ে।

দুটো ঢেউ পর পর লোকটিকে ধাক্কা দিল। বিষ্টু ধর জলে নেমেছে।

''আচ্ছা শরীরটাকে চাকর বানানো, সেটা কী ব্যাপার?''

''সোজা ব্যাপার। লোহা চিবিয়ে খেয়ে হুকুম করবেন হজম করো, পাকস্থলী হজম করবে। বলবেন পাঁচ মাইল হাঁটিয়ে নিয়ে চলো, পা জোড়া অমনি পৌঁছিয়ে দেবে। সখ হলো গাছের ডাল ধরে ঝুলবেন, হাত দুটো আপনাকে ঝুলিয়ে রেখে দেবে। এইসব আর কী।''

লোকটি জল থেকে উঠে আলতোভাবে মাটির ওপর দিয়ে হেঁটে সিঁড়িতে দাঁড়াল। ভিজে গামছাটা নিংড়ে পায়ে লাগা মাটি ধুয়ে গঙ্গার দিকে তাকাল। ঝাপসাভাবে দেখল, পাড়ের কাছে জলে কিলবিল করছে মানুষ। তার মধ্যে কোনিকে চিনে নেওয়া সম্ভব হলো না।

লুঙ্গি ও পাঞ্জাবি পরে, ঝোলা কাঁধে চশমা মুছতে মুছতে লোকটি একবার সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াল, চশমা চোখে দিয়ে পাড়ের ডাইনে-বাঁয়ে তাকাল, হঠাৎ নজরে এল গঙ্গার বুকে চারটি কালো ফুটকি। তারা সিকি গঙ্গা পার হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।

লোকটি আপনমনে একবার বলল: ‘‘কোনি। কো ও ও নি।’’

কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ভিজে গামছাটি পাগড়ির মতো মাথায় জড়িয়ে লোকটি বাড়ির পথে রওনা হলো।

মিনিট পনেরো পর সরু গলির মধ্যে একতলা টালির চালের একটি বাড়িতে লোকটি ঢুকল। সদর দরজার পরই মাটির উঠোন। টেনেটুনে একটি ভলিবল কোর্ট তাতে হয়ে যায়। লঙ্কা পেঁপে, জবা থেকে চালকুমড়ো পর্যন্ত, উঠোনটা নানান গাছে দখল হয়ে আছে। একদিকে টিনের চালের রান্নাঘর ও কলঘর আর একদিকে দালান ও তার পিছনে দুটি ঘর। একতলা বাড়িটি চারদিকের উঁচু বাড়িগুলোর মধ্যে খুব শান্তভাবে যেন উবু হয়ে বসে। উত্তর দিকে বাড়ির মালিক হলধর বর্ধন এই একতলা বাড়িটি কেনার জন্য বার দুয়েক প্রস্তাব করেছে, কিন্তু লোকটি সংসারে যার স্ত্রী এবং দুটি বিড়াল ছাড়া আর কেউ নেই, বিনীতভাবেই তা প্রত্যাখ্যান করে।

বাড়ির কলে জল আসে সামান্য। লোকটির স্ত্রীর নাম লীলাবতী। জল খরচ করাটা লীলাবতীর সখ, বিড়াল পোষার মতোই। ফলে লোকটিকে স্নান করার জন্য প্রায়ই রাস্তার টিউবওয়েলটির সাহায্য নিতে হয়। আজ সকাল থেকে টিউবওয়েলের মুখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে না। তাই বহুকাল পর সে গঙ্গাস্নানে গিয়েছিল।

লোকটি বাড়ির মধ্যে ঢুকে উঠোনে টাঙানো তারে ভিজে প্যান্টটা মেলেছে, তখন ঘর থেকে বেরিয়ে এল ঢলঢলে প্যান্ট পরা বেঁটে, হৃষ্টপুষ্ট একজন।

‘‘ক্ষিদ্দা, তোমার জন্য অনেকক্ষণ বসে আছি, আর বাড়ি পাহারা দিচ্ছি। দোকান থেকে কে বউদিকে ডাকতে এসেছিল, ‘আসছি’ বলে সেই যে গেছে —’’

‘‘ভেলো, চটপট একটু চা বানা দেখি।’’

‘‘বউদি যদি এসে পড়ে!’’

ক্ষিদ্দা অর্থাৎ ক্ষিতীশ সিংহ কয়েক সেকেন্ড ভেবে বলল, ‘‘তাহলে থাক, বরং তুই কী জন্যে এসেছিস বল?’’

"ক্লাবের আজকের মিটিংয়ে যাবে নাকি?"

"নিশ্চয় যাব ছেলেরা খাটবে না, ডিসিপ্লিন মানবে না, জলে নেমে শুধু ইয়ারকি ফাজলামো করবে। এসব ছেলেদের ক্লাব থেকে বেরিয়ে যেতে বলাটা কি এমন দোষের! একজনও কি তাই নিয়ে কিছু ভাবে? আর ক্ষিতীশ সিঙ্গি কী বলল অমনি তাই নিয়ে কাউন্সিলের মিটিং ডাকা হলো।"

"সেজন্য তো নয়, আসলে হরিচরণদা আর তার গ্রুপটির রাগ আছে তোমার ওপর। ওরাই শ্যামল আর গোবিন্দকে উসকে তোমার এগেনস্টে চার্জ আনিয়েছে।"

"আমি তা জানি। হরিচরণের বহুদিনের ইচ্ছে চিফ্ ট্রেনার হওয়ার। আমাকে বলেওছিল গত বছর। আমি বলেছিলুম, হরি, একটা চ্যাম্পিয়ন শুধু খাওয়া-দাওয়া আর ট্রেনিং দিয়েই তৈরি করা যায় না রে। তার মন-মেজাজ বুঝে তাকে চালাতে হয়। ট্রেনারকে মনস্তাত্ত্বিক হতে হবে, তার মানে কমনসেন্স প্রয়োগ করতে হবে। গুরুকে শ্রদ্ধেয় হতে হবে শিষ্যের কাছে। কথা, কাজ, উদাহরণ দিয়ে মনের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা বাসনা জাগিয়ে তুলতে হবে। তাকে মোটিভেট করতে হবে। এসব তোর দ্বারা সম্ভব নয়। তুই শুধু চেঁচামেচি গালাগালি করেই খাটাতে চাস, চিফ্ ট্রেনার হওয়া তোর কম্মো নয়।"

"ক্ষিদ্দা, তোমার এই লেকচার দেবার বদ অভ্যেসটা ছাড়ো। এককথায় যেখানে কাজ হয়, তুমি সেখানে দশ কথা বলো। হরিচরণদাকে অত কথা বলার কী দরকার ছিল। যাক্‌গে, আজ তুমি মিটিংয়ে যেও না, ওরা ঠিক করছে তোমাকে অপমান করবে।"

"করে করবে।" এই বলে ক্ষিতীশ তার পায়ে মাথা ঘষায় ব্যস্ত বিশুকে কোলে তুলে গলা চুলকে দিতে লাগল। চোখ বুঁজে বিশু ঘর্‌র্ ঘর্‌র্ শুরু করল।

"তাহলে যাবেই!" নেমে যাওয়া প্যান্ট এবং কণ্ঠস্বর হ্যাঁচকা দিয়ে টেনে তুলে ভেলো বলল।

ক্ষিতীশ ঘরের দিকে যেতে যেতে অস্ফুটে বলল, "হুঁ।"

তখনই বাড়িতে ঢুকল লীলাবতী সিংহ। অতি ছোট্টখাট্ট, গৌরবর্ণা এবং গম্ভীর। পায়ে চটি, হাতে ছাতা। দু-জনের দিকে তাকিয়ে অবশেষে ভেলোকে বলল, "বেলা অনেক হয়েছে, চাট্টি ভাত খেয়ে যেও।"

ভেলোর হঠাৎ যেন কাণ্ডজ্ঞান ফিরে এল। ঘড়ি দেখেই ব্যস্ত হয়ে বলল, "না না বউদি, ইস্‌স্ বড্ড দেরি হয়ে গেল, বাড়িতে ভাত নিয়ে বসে আছে। আমি এখন যাই। ক্ষিদ্দা, তোমার কিন্তু না গেলেই ভালো।"

ভেলো চলে যেতেই লীলাবতী প্রশ্ন করল ক্ষিতীশকে "না গেলেই ভালো মানে?"

"আজ ক্লাবের একটা মিটিং আছে। ও বলছে সেখানে আমাকে নাকি কেউ কেউ অপমান করবে যাতে ক্লাব ছেড়ে বেরিয়ে যাই।"

"তাহলে তো ভালোই হয়। ক্লাব-ক্লাব করে তো কোনোদিন ব্যবসা দেখলে না। আমি মেয়েমানুষ, আমাকেই কিনা দোকান দেখতে হয়। নেহাত ছেলেপুলে নেই তাই। যদি ক্লাব তোমায় তাড়ায় তাহলে আমি বেঁচে যাই।"

লীলাবতী রান্নাঘরে ঢুকল। ক্ষিতীশ বিষণ্ণ চোখে দালানে বসে বিশুর মাথায় আনমনে হাত বোলাতে লাগল। এই সময় খুশি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ডন দিয়ে, হাই তুলে ধীরে ধীরে সে চামরের মতো কালো লেজটি উঁচিয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল ক্ষিতীশের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে।

"কই এসো।" রান্নাঘর থেকে ডাক এল।

ক্ষিতীশ অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখে গিয়ে ভাত খেতে বসল।

খাওয়ার আয়োজন সামান্য। রান্না হয় কুকারে। প্রায় সবই সিদ্ধ। এটা খরচ, সময় ও শ্রম সংক্ষেপের জন্য নয়। ক্ষিতীশ বিশ্বাস করে, বাঙালিয়ানা রান্নায় স্বাস্থ্য রাখা চলে না। এতে পেটের বারোটা বাজিয়ে দেয়। সেইজন্যই বাঙালিরা শরীরে তাগদ পায় না, কোনো খেলাতেই বেশি উঁচুতে উঠতে পারে না। খাদ্যপ্রাণ যথাসম্ভব অটুট থাকে সিদ্ধ করে খেলে এবং সর্বাধিক প্রোটিন ও ভিটামিন পাওয়া যায় এমন খাদ্যই খাওয়া উচিত।

প্রথম দিকে লীলাবতী বিদ্রোহী হয়েছিল, সরষেবাটা, শুকনো লঙ্কাবাটা, পাঁচফোড়ন, জিরে, ধনে প্রভৃতি বস্তুগুলি রান্নায় ব্যবহারের সুযোগ হারিয়ে। তুমুল ঝগড়া এবং তিনদিন অনশন সত্যাগ্রহেও কাজ হয়নি। ক্ষিতীশ তার সিদ্ধান্তে গোঁয়ারের মতো অটল থাকে। তার এক কথা: 'শরীরের নাম মহাশয় যা সহাবে তাই সয়।' অবশেষে লীলাবতী সপ্তাহে একদিন সরষে ও লঙ্কাবাটা ব্যবহারের অনুমতি পায়, শুধুমাত্র নিজের খাবারের জন্য। ক্ষিতীশ কখনো যজ্ঞিবাড়ির নিমন্ত্রণে যায় না। ক্লাবের ছেলেমেয়েদের সে প্রায়ই শোনায়: 'ডাক্তার রায় বলতেন, বিয়ে বাড়ির এক একটা নেমন্তন্ন খাওয়া মানে এক এক বছরের আয়ু কমে যাওয়া। বড়ো খাঁটি কথা বলে গেছেন।'

ক্ষিতীশ কথা না বলে খাওয়া শেষ করল।

ও যে রাগ করেছে লীলাবতী বুঝতে পেরেছে। বলল, ''ক্লাব থেকে তাড়াবে কেন? কী দোষ করলে?''

ক্ষিতীশ পালটা প্রশ্ন করল, ''তুমি এখন আবার দোকানে গেছলে কেন?''

গ্রে স্ট্রিটে ট্রামলাইন ঘেঁষে একফালি ঘরে দোকানটি। নাম 'প্রজাপতি'। আগে নাম ছিল 'সিন্হা টেলারিং'। দুটি দর্জিতে জামা-প্যান্ট তৈরি করত, আর দেয়াল আলমারিতে ছিল কিছু সিন্থেটিক কাপড়। ক্ষিতীশ তখন দোকান চালাত। দিনে দু-ঘন্টাও দোকানে বসত না। দুপুর বাদে তাকে সর্বদাই পাওয়া যেত জুপিটার সুইমিং ক্লাবে। তারপর একদিন সে আবিষ্কার করল আলমারির কাপড় অর্ধেকেরও বেশি অদৃশ্য হয়েছে, দোকানের ভাড়া চার মাস বাকি এবং লাভের বদলে লোকসান শুরু হয়েছে।

তখনই লীলাবতী হস্তক্ষেপ করে, দোকানের দায়িত্ব নেয়। টেলারিং ডিপ্লোমা পাওয়া দুটি মহিলাকে নিয়ে সে দোকানটিকে ঢেলে সাজায় নিজের গহনা বাঁধা দিয়ে। নাম দেয় 'প্রজাপতি'। পুরুষদের পোশাক তৈরি বন্ধ করে দিয়ে শুধুমাত্র মেয়েদের এবং বাচ্চাদের পোশাক তৈরি করে। দোকানে পুরুষ কর্মচারী নেই এবং চার বছরের মধ্যেই 'প্রজাপতি' ডানা মেলে দিয়েছে। আগে তিনদিনে ব্লাউজ তৈরি করে দেওয়া হতো, এখন দশদিনের আগে সম্ভব হচ্ছে না। লীলাবতী তার গহনাগুলির অর্ধেকই ফিরিয়ে এনেছে।

''এখন তো আর জায়গায় কুলোয় না, তাই বড়ো ঘর খুঁজছি। হাতিবাগানের মোড়ে একটা খোঁজ পাওয়া গেছে। আমাদেরই এক খদ্দেরের বাড়ি। বাড়ির গিন্নি এসেছিল মেয়ের ফ্রক করাতে। তাই গেছলুম কথা বলতে।'' লীলাবতী এঁটো থালাটা টেনে নিয়ে তাতে ভাত বেড়ে ডাল মাখতে মাখতে বলল।

ক্ষিতীশের প্রবল আপত্তি ছিল তার খাওয়া থালায় লীলাবতীর খাওয়ায়। 'আনহাইজিনিক। এইসব কুসংস্কারেই বাঙালি জাতটা গোল্লায় গেল।' এই বলে ক্ষিতিশ তর্ক শুরু করেছিল। কিন্তু লীলাবতী যখন অতিরিক্ত ঠান্ডা স্বরে বলল, 'এটা আমার ব্যাপার, মাথা ঘামিও না।' তখন মুহূর্তে বুঝে যায় আর কথা বাড়ালে তাকেই গোল্লায় যেতে হবে। তবে ক্ষিতীশ তার প্রতিবাদ জানিয়ে যাচ্ছে। লীলাবতীর খাওয়ার সময় তাই কখনোই সে সামনে থাকে না।

শোবার ঘরের দেয়ালে ক্ষিতিশের বাবা-মা, ধ্যানমগ্ন মহাদেব, কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের সারথি শ্রীকৃষ্ণ এবং ম্যাগাজিন থেকে কেটে বাঁধানো মেডেল গলায় ডন শোলান্ডার ও ভিকট্রি স্ট্যান্ডে দু-হাত তুলে দাঁড়ানো ডন ফ্রেজারের ছবি, পাশাপাশি টাঙানো। এছাড়া আছে — সাধারণত যা থাকে — খাট, আলমারি, বাক্স, আলনা এবং টুকিটাকি সাংসারিক জিনিস। পাশের ঘরে বই, ম্যাগাজিন, একটা তক্তপোশ এবং তার নীচে ট্রেনিংয়ের জন্য রবারের দড়ি, স্প্রিং, লোহা ছাড়া আর কিছু নেই। এই ঘরে ক্ষিতীশ দুপুরে এক ঘণ্টা ঘুমোয়। পাখা নেই, বিছানা নেই। ওর মতে, চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে শিষ্যকেই নয়, গুরুকেও কঠোর জীবনযাপন করতে হবে। অবশ্য তার কোনো শিষ্য নেই।

তক্তপোশে শুয়ে চোখ বুঁজে ক্ষিতীশ দীর্ঘশ্বাস ফেলল। শিষ্য কোথায়!

ঘুম আসার ঠিক আগের মুহূর্তে, ক্ষিতীশের আবছায়া চেতনায় ফুটে উঠল লম্বা দুটো হাত বৈঠার মতো গঙ্গার জলে উঠছে আর পড়ছে।

মিলিয়ে গিয়ে নতুন আর একটি ছবি সে দেখল। ফণা তোলা কেউটের মতো হিলহিলে কাদায় লেপা সরু একটা দেহ। লম্বা লম্বা হাত এলোপাথাড়ি ডাইনে-বাঁয়ে ঘোরাচ্ছে। 'ফাইট কোনি, ফাইট।'

ঘুমিয়ে পড়ার আগে ক্ষিতীশ অকারণেই অস্ফুটে উচ্চারণ করল, ''কো ও ও নি।''

সম্ভবত নামটা তার ভালো লেগেছে।

টেবল টেনিস বোর্ডটায় কাপড় বিছিয়ে টেবল। সেটা ঘিরে সাতজন বসে। তার মধ্যে একটি চেয়ার খালি। ওরা চাপা স্বরে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। ঘরের বাইরে কয়েকটি ছেলে, কার যেন প্রতীক্ষায়।

জুপিটার সুইমিং ক্লাবের নতুন প্রেসিডেন্ট এবং এম এল এ বিনোদ ভড়, ডানদিকে ঝুঁকে সম্পাদক ধীরেন ঘোষকে বলল, ‘‘একটাই অ্যাজেন্ডা, না আরো আছে?’’

ধীরেন ঘোষ তার সরু গলাটি যথাসম্ভব লম্বা করে চশমার নীচের অংশের প্লাস পাওয়ারের মধ্য দিয়ে টেবলে রাখা কাগজের দিকে তাকাল।

‘‘মেন আইটেম একটাই, আর যা আছে তা খুবই মাইনর।’’

‘‘কোরাম হয়েছে তো?’’

‘‘হ্যাঁ, সবাই হাজির।’’ ধীরেন ঘোষ এরপর ব্যস্ত হয়ে বলল, ‘‘জগু, চা-সন্দেশ দিতে বল।’’

যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে মাত্র, তখনই দরজাটা খুলে গেল। ক্ষিতীশ সিংহ ঘরের প্রতিটি লোকের মুখে উপর চোখ বুলিয়ে, প্রেসিডেন্টের মুখোমুখি খালি চেয়ারটায় বসার আগে সভাকে নমস্কার জানাল।

জগু জিজ্ঞাসু চোখে ধীরেন ঘোষের দিকে তাকাল, মাথা হেলিয়ে ধীরেন ঘোষ বলল, ‘‘একটু পরে আনবি।’’

‘‘আমার দেরি হয়ে গেল।’’ ক্ষিতীশ ফিকে হেসে প্রেসিডেন্টের দিকে তাকাল।

‘‘না না, মিনিট চারেক মাত্র দেরি হয়েছে।’’ বিনোদ ভড় ঘড়ি দেখে ধীরেন ঘোষকে বলল, ‘‘আমার কিন্তু একটু তাড়া আছে।’’

‘‘নিশ্চয় নিশ্চয়, এখুনি শুরু করছি। বেশিক্ষণ লাগার মতো কিছুই নেই, শুধু সুইমারদের চিঠিটা ছাড়া। আর সেটা আগেই সারকুলেট করা হয়েছে, সুতরাং নতুন করে বলার কিছু নেই।’’

‘‘হ্যাঁ আছে।’’

সবাই ক্ষিতীশের দিকে তাকাল।

‘‘আমার বিরুদ্ধে চার্জগুলো স্পষ্ট করে চিঠিতে বলা নেই। সেগুলো জানতে চাই।’’

সবাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল।

বিনোদ ভড় বলল, ‘‘ধীরেনবাবু, ওর বিরুদ্ধে যা যা অভিযোগ উঠেছে সেগুলো তাহলে বলুন।’’

ধীরেন ঘোষ বিব্রতভাবে হরিচরণ মিত্তিরের দিকে তাকাল, হরিচরণ নড়ে-চড়ে বসল।

‘‘ক্ষিদ্দা সম্পর্কে অভিযোগ ছেলেদের মানে সুইমারদের। যারা সাত বছর, আট বছর আমাদের ক্লাবের হয়ে বিভিন্ন কম্পিটিশনে নামছে, মেডেল আনছে। মানে, আমাদের মুখোজ্জ্বল করছে।’’

‘‘বাজে কথা।’’ ক্ষিতীশ গম্ভীর স্বরে বলল, ‘‘মেডেল হয়তো আনে কিন্তু মুখোজ্জ্বল করার মতো কিছুই করেনি। শ্যামল চার বছর আগে এক মিনিট চার সেকেন্ডে হানড্রেড মিটার ফ্রি স্টাইল টানতো, এখনো তাই টানে। এটা কি মুখোজ্জ্বল করার মতো ব্যাপার?’’

হরিচরণ কথাগুলো না শোনার ভান করে বলতে লাগল, ‘‘এইসব সুইমাররাই হচ্ছে ক্লাবের প্রাণ। এদের নিয়েই ক্লাব টিকে আছে, এগিয়ে চলেছে। এরা উজ্জ্বল, এরা চঞ্চল। এদের হ্যান্ডেল করতে হলে এদের মতো হয়ে এদের সঙ্গে মিশতে হবে, বুঝতে হবে, আধুনিক সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হবে।’’

‘‘তার মানে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মারবে, পড়াশুনা করবে না, ট্রেনিং করবে না — একে উচ্ছলতা বলে মানতে হবে! এদের সঙ্গে তাল রেখে আমাকে আধুনিক হতে হবে, তবেই এদের হ্যান্ডেল করা যাবে?’’

‘‘কিন্তু ওদের মন-মেজাজ বোঝার ক্ষমতা, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, ক্ষিদ্দার নেই।’’

হরিচরণ সকলের মুখের দিকে তাকাল। তিন-চারটি মাথা নড়ে উঠল একসঙ্গে সমর্থন জানিয়ে। ক্ষিতীশের চোখ পিটপিট করতে লাগল, পুরু লেন্সের ওধারে।

‘‘ক্ষিদ্দা জুনিয়ার ছেলেদের সামনেই শ্যামলকে তার টাইম আর আমেরিকার ১২ বছরের মেয়েদের টাইমের তুলনা করে অপমান করেছেন; গোবিন্দ এখনো ব্রেস্ট স্ট্রোকে বেঙ্গল রেকর্ড হোল্ড করছে, লাস্ট ইয়ারেও বোমবাই ন্যাশনালে গেছল, তাকে বলেছেন কান ধরে ক্লাব থেকে বার করে দেবে। সুহাস ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়ে দিন দশেক আসতে পারেনি। তার বাড়িতে গিয়ে ক্ষিদ্দা সুহাসের বাবাকে যা তা কথা বলে এসেছেন। অমিয়া আর বেলা জুপিটার ছেড়ে অ্যাপোলোয় গেছে শুধুই ক্ষিদ্দার জন্য। উনি ওদের চুল কাটতে চেয়েছিলেন। পুরুষদের মতো ওদেরও বারবেল নিয়ে একসারসাইজ করার জন্য ঝগড়া করতেন। ওদের ড্রেস, ওদের সাজ নিয়ে রোজই খিটখিট করতেন। লাস্ট ইয়ারে আপনারা দেখেছেন, ওই দুটি মেয়ের জন্যই স্টেট মিটে অ্যাপোলো টিম চ্যাম্পিয়নশিপ পায়।’’

হরিচরণ থামল। ক্ষিতীশের দিকে এতক্ষণ সে তাকায়নি। দেখল মুচকি মুচকি হাসছে। তাইতে সে অস্বস্তি বোধ করে ধীরেন ঘোষ, প্রফুল্ল বসাক এবং বদু চাটুজ্জের মুখের দিকে তাকাল।

নস্যির কৌটো বার করার জন্য পকেটে হাত ঢুকিয়ে, গলা খাঁকারি দিয়ে বদু চাটুজ্জে সিধে হয়ে বসল।

"প্রেসিডেন্ট স্যার, আমার একটা কথা বলার আছে। ট্রেনার যে হবে তার উপর ছেলেদের বা মেয়েদের শ্রদ্ধা থাকা চাই, আস্থা থাকা চাই। সে যেটা বলবে ওরা যেন নিশ্চিন্তে চোখ বুঁজে সেটা করতে পারে। কিন্তু ক্ষিতীশ ওদের যা বলে সেটা ওরা বিশ্বাসভরে নিতে পারে কি?"

বদু চাটুজ্জে নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য কথা থামিয়ে রুমাল বার করল। নাক মুছল গভীর মনোযোগে। রুমাল পকেটে রাখল।

"ক্ষিতীশ নিজে কখনো সাঁতার কাটেনি। কম্পিটিশনে কখনো নেমেছে বলে জানি না। ওর কথা ছেলেমেয়েরা কেন গ্রাহ্য করবে?"

"সে কী!" প্রেসিডেন্ট বিনোদ ভড় অবাক হয়ে ক্ষিতীশের দিকে তাকাল। "আপনি সাঁতার জানেন না?"

ক্ষিতীশ মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, "সাঁতার জানি না বলতে বদু নিশ্চয় মিন করছে, আমি কখনো কোনো কম্পিটিশনে মেডেল পাইনি। তাই না?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তাই-ই বলছি।" ব্যস্ত হয়ে বদু বলল। "কোচের রেপুটেশন থাকা দরকার। নয়তো ছেলেমেয়েরা মানবে কেন? হরিচরণকে ওরা মানে কেন? ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন ছিল, অলিম্পিকেও গেছে। গঙ্গায় ১৩ মাইলের কম্পিটিশন পর পর তিনবার জিতেছে।"

"আপনি ওলিম্পিকে গেছলেন!" বিনোদ ভড়ের বিস্মিত ভ্রূ কপাল বেয়ে চুলে গিয়ে ঠেকল।

কিঞ্চিৎ গদ্‌গদ স্বরে হরিচরণ বলল, "লন্ডনে ফরটি এইট ওলিম্পিকে আমি দেড় হাজার মিটারে ইন্ডিয়াকে রিপ্রেজেন্ট করেছি। ওয়াটারপোলো টিমেও ছিলুম।"

"কী রেজাল্ট করেছিলেন?" প্রেসিডেন্ট ঝুঁকে পড়ল টেবিলে।

হরিচরণ দ্রুত সকলের মুখের উপর একবার চোখ বুলিয়ে ঢোঁক গিলে বলল, "পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ডের জন্য ব্রোঞ্জটা মিস করেছি।"

হঠাৎ বিষম খেয়ে কাশতে শুরু করল ক্ষিতীশ। সবাই তার দিকে তাকাল।

কাশি থামিয়ে ক্ষিতীশ বলল, "আই অ্যাম সরি। মাঝে মাঝে আমার এরকম হয়।"

প্রেসিডেন্ট বিরক্ত চোখ দুটো সরিয়ে নিয়ে আবার রাখল হরিচরণের মুখে।

"গোল্ড পেয়েছিল আমেরিকার ম্যাকলেন। জল থেকে উঠে আমায় বলেছিল, তুমি পাশে ছিলে তাই এত ভালো চার্জ পেয়েছি।"

"বটে বটে, তা আপনি কী বললেন?"

"আমি আর কী বলব, ওকে কনগ্র্যাচুলেট করে বললুম, ইন্ডিয়াতে যে টাইম করে এসেছি সেটা যদি আজ করতে পারতুম তাহলে ...."

হরিচরণ থেমে গেল।

খুক্ খুক্ একটা শব্দ হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট বিরক্ত হয়ে বলল, "আবার আপনি কাশছেন? নিশ্চয় আপনার কাশির অসুখ আছে।"

ক্ষিতীশ মুখ নীচু করে ফিসফিসিয়ে বলল, "হরি, গোল্ড না সিলভার, তাহলে কোনটে হতো?"

হরিচরণ উত্তেজিত স্বরে বলল, "মেডেলের কথা তো আমি বলিনি, তুমি হঠাৎ গায়ে পড়ে টিপ্পুনি কাটছ কেন?"

"জেলাসি।"

নস্যির কৌটোয় চাঁটা দিয়ে বদু মন্তব্য করল।

"ক্ষিতীশ বড়ো ফালতু কথা বলে।" কার্তিক সাহা এতক্ষণে মুখ খুলল। "বারবার দেখেছি কখনই ও হরিকে সহ্য করতে পারে না।"

"জেলাসিই হোক ফেলাসিই হোক, আমাকে পাঁচজনের সামনে বিদ্রূপ করে তুমি কী আনন্দ পাও ক্ষিদ্দা বলো তো?"

ক্ষিতীশ চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে টেবিলে রাখল। কঠিন স্বরে বলল, "আমার বিরুদ্ধে আর কী অভিযোগ আছে ধীরেন?"

ধীরেন ঘোষ তাড়াতাড়ি ঝুঁকে কয়েকটা কাগজ উলটেপালটে বলল, "এই সবই আর কী। অভিযোগ এনেছে সুইমাররা। ওরা বাইরেই আছে। প্রেসিডেন্ট যদি বলেন তো ওরা নিজেরাই এখানে এসে বলতে পারে।"

"না, তার দরকার নেই।" ক্ষিতীশ চশমাটা চোখে পরল, "অভিযোগগুলি সত্যি।"

টেবলের মুখগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কেউ মাথা নাড়ল, কেউ নড়েচড়ে বসল। ওদের ভাবভঙ্গিতে এই কথাটাই ফুটে উঠল — এইবার, তাহলে বাছাধন এইবার কী বলবে?

"আমি জানি ওরা কি বলবে। বলবে, আমি জলে নামি না, খাটতে বলি, না খাটলে গালাগালি করি। আপনারা বলবেন, আমি রেজাল্ট দেখাতে পারিনি তিন-চার বছর, আমার ব্যবহারে সুইমাররা বিদ্রোহ করেছে।"

"এমনকি মারবেও বলেছে।" যজ্ঞেশ্বর ভট্টাচার্য কথাটা বলেই, ধীরেন ও হরিচরণের ভ্রূকুটি দেখে থতমত হয়ে, "কী কাণ্ড, এখনো চা দিয়ে গেল না।" বলতে বলতে উঠে বেরিয়ে গেল।

"অভিযোগের জবাব নিশ্চয় আমাকে দিতে হবে।"

প্রেসিডেন্ট গম্ভীর হয়ে বলল, "সেটা আপনার ইচ্ছে। কিছু বলার থাকলে নিশ্চয় আমরা শুনব।"

সারা ঘর উৎকণ্ঠিত হয়ে অপেক্ষা করছে। চশমাটা আবার টেবলে রেখে ক্ষিতীশ চোখ বোঁজে।

"এই ক্লাবে আমি প্রথম আসি পঁয়ত্রিশ বছর আগে। ধীরেনও তখন আসে। বছর পাঁচেক পর হরিচরণ। ওদের মতো জুপিটারকে আমিও ভালোবাসি। আমিও চাই জুপিটারের গৌরব, চাই ভারতের সেরা হয়ে উঠুক জুপিটার। এই গৌরব এনে দেয় সাঁতারুরা, ওয়াটারপোলো প্লেয়াররা, ডাইভাররা। ওদের পারফরমেন্স যত উঠবে, গৌরবও তত বাড়বে। আমার যা কিছু চেষ্টা, তা ওদের উন্নতির জন্যই। এজন্য আমি কঠোর হয়েছি, গালিগালাজও দিয়েছি।"

ক্ষিতীশের বলার ভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরে ঘরটা গম্ভীর থমথমে হয়ে উঠল।

"সাঁতারে অবিশ্বাস্য রকমে পৃথিবী এগিয়ে গেছে। আর আমরা? আমাদের এক একটা রেকর্ডের বয়স দশ পনেরো বছর। পঁচিশ বছর হতে চলল শচীন নাগের রেকর্ডের বয়স! কেন এই থমকে থাকা? যেভাবে পৃথিবী এগোচ্ছে, আমাদেরও সেইভাবে এগোতে হবে।"

"এসব এমন কিছু কথা নয়; আমাদেরও জানা আছে। শুনতে ভালোই লাগে।" হরিচরণ ভারিক্কি চালে বলল এবং প্রেসিডেন্টের দিকে তাকাল। "আসল যে জিনিস ফুড সেটা কই? খাটবে যে খাদ্য কই? তা যখন পাওয়া যাবে না তখন খাটিয়ে খাটিয়ে টি বি রোগ ধরিয়ে দিয়ে লাভ কিছু হবে?"

"ঠিক কথা। ফুড কই?"

যজ্ঞেশ্বর টেবল চাপড়ে বলে উঠল।

প্রেসিডেন্ট এবং ধীরেন ঘোষ মাথা নাড়ল। বদু কৌটো থেকে বড়ো এক টিপ নস্যি বার করল।

"বাজে কথা।"

ক্ষিতীশ চাপা এবং দৃঢ়স্বরে বলল।

‘‘আজ পর্যন্ত কেউ টি বি রুগী হয়েছে সাঁতার কেটে, এমন কথা শুনিনি। আসলে এটা অলস ফাঁকিবাজদের, যাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই তাদের অজুহাত। যতটুকু খাদ্য আমরা জোটাতে পারি, সেই অনুপাতে আমরা ট্রেনিং করি না। শ্যামল, গোবিন্দ বিদ্যেবুদ্ধির জন্য নয়, সাঁতারের জন্যই চাকরি পেয়েছে। কিন্তু সাঁতারকে তারা এর বিনিময়ে কী দিচ্ছে? এরা অকৃতজ্ঞ। এরা গুছিয়ে রোজ পাঁচ টাকাও যদি খাওয়ার জন্য খরচ করে, ডিসিপ্লিনড লাইফ লিড করে, নিয়মিত কঠিন ট্রেনিং করে, তাহলে দু-বছরেই এরা এক মিনিটে একশো মিটার ফ্রি স্টাইল কাটবে, এক পাঁচে ব্যাক স্ট্রোক কাটবে।’’

‘‘তাহলে এদের ট্রেনিং করাতে পারেননি কেন?’’ ধীরেন বলল।

‘‘ছেলে ফেল করলে দোষটা মাস্টারমশায়েরও।’’ কার্তিক কনুই দিয়ে বদুকে খোঁচা দিল।

‘‘নিশ্চয়, শুধু ওদের অকৃতজ্ঞ বলে নিজের দোষ স্খালন করলে কি চলে!’’

‘‘না, আমি দোষ স্খালন করতে চাই না। বরং আমি বলতে চাই, এদের দিয়ে আর কিছু হবে না। এদের বয়েস হয়ে গেছে, এদের মনে পচ ধরেছে। এদের পিছনে পরিশ্রম করে লাভ নেই।’’

‘‘আমি বিশ্বাস করি না।’’ হরিচরণের তীব্র স্বরে ক্ষিতীশও বিস্মিত হলো।

‘‘কী বিশ্বাস করিস না?’’

‘‘এদের দিয়ে এখনো টাইম কমানো যায়। আমি করাতে পারি। আমি পারি এদের খাটাতে। পচ-টচ ধরেছে এসব বাজে কথা।’’

ক্ষিতীশ কিছুক্ষণ হরিচরণের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

‘‘তাহলে তুই দায়িত্ব নে। আমি আজ থেকে চিফ ট্রেনারের পদ ছেড়ে দিলাম। রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়ে দেবো। আমি কাল থেকে আর আসব না।’’

‘‘না না, আসবে না এটা কী কথা!’’ বদু ব্যস্ত হয়ে উঠল। ‘‘এতদিনকার মেম্বার!’’

ক্ষিতীশ হাসল ম্লানভাবে, তারপরই চোখ দুটো পিট পিট করে উঠল। প্রেসিডেন্টকে লক্ষ করে বলল, ‘‘ট্রেনার হতে গেলে নামকরা সাঁতারু হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। পৃথিবীর নামকরা কোচেরা — ট্যালবট, কারলাইল, গ্যালাঘার, হেইন্স, কাউন্সিলম্যান এরা কেউ ওলিম্পিক চ্যামপিয়ন নয়। জলে নেমে এদের কোচ করতে হয় না। এরা সুইমারদের কোচ, নভিসদের নয়। জলের উপর থেকেই অনেক ভালো লক্ষ করা যায়, তাই ডাঙাতেই আমি থাকি।’’

‘‘ক্ষিদ্দা, তুমি দেখছি ওইসব কোচেদের সঙ্গে নিজেকে এক পঙ্‌ক্তিতে ফেললে।’’ যজ্ঞেশ্বর কৃত্রিম বিস্ময় চোখে ফোটাল।

‘‘ওরা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন, অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন তৈরি করছে, তুমি তো একটা বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নও তৈরি করতে পারনি!’’ কার্তিক সাহার গলায় বিদ্রূপ মোচড় দিল।

‘‘পারবে পারবে, নিশ্চয় পারবে। ওয়ার্ল্ড রেকর্ড আমরা শিগ্গিরই পাব, তাই না ক্ষিতীশ?’’ ধীরেন ঘোষ মুচকি মুচকি হাসতে লাগল।

‘‘চ্যাম্পিয়ন সুইমার তৈরি করা এদেশে সম্ভব নয়।’’ প্রেসিডেন্ট বিনোদ ভড় এতক্ষণে কথা বলল।

ক্ষিতীশ উঠে দাঁড়াল।

‘‘কোনো দেশেই সম্ভব নয়। চ্যাম্পিয়নরা জন্মায়, ওদের তৈরি করা যায় না। ওদের খোঁজে থাকতে হয়, লক্ষণ মিলিয়ে চিনে নিতে হয়।’’ ক্লান্তস্বরে কথাগুলো বলে ক্ষিতীশ দরজার দিকে এগোল।

‘‘সেই ভালো, এবার থেকে তপস্যা শুরু করো ক্ষিদ্দা।’’

‘‘ক্ষিতীশ, চা-টা খেয়ে যাও।’’

‘‘ক্ষিতীশবাবু, ক্লাবে আপনার কিন্তু রেগুলার আসা চাই।’’

ঘর থেকে বেরিয়ে ক্ষিতীশ দেখল শ্যামল, গোবিন্দ এবং আরো চার পাঁচটি ছেলে দাঁড়িয়ে। প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাল সে। ওরা হঠাৎ কাঠের মতো হয়ে গেল।

''তোদের অনেক বকেছি-ঝকেছি, কটু কথাও বলেছি। আর এসব শুনতে হবে না। আজ থেকে আমি আর এ ক্লাবের ট্রেনার নই। সাঁতারটা মন দিয়ে করিস।''

ক্ষিতীশ মাথা নামিয়ে ধীর পায়ে ক্লাবের বাইরে এসে দাঁড়াল।

কমলদিঘির কালো জলের উপর পার্কের আলোগুলো খড়ির মতো দাগ টেনেছে। জুপিটার ক্লাববাড়ির চুড়োর ঘড়িতে আটটা বাজতে পাঁচ। দিঘিটা আকারে গোল। তাকে ঘিরে ইট বাঁধানো রাস্তা। নারী পুরুষ শিশুর ভিড়ে রাস্তাটা গিজগিজ করছে। আলোগুলোর নীচে তাস খেলা চলছে, অক্‌সন ব্রিজ বা টোয়েন্টিনাইন। মাঝে মাঝে দমকা চিৎকার উঠছে তাসের আড্ডা থেকে। বেঞ্চগুলোয় বসার স্থান নেই। ফুলগাছের ঝোপগুলো লোহার বেড়ায় ঘেরা। বেড়ায় ঠেস দিয়ে যুবকরা গল্প করছে। ঘুগনি, আলুকাবলি, বাদাম, ঝালমুড়ি বা কুলফি মালাইওয়ালারা ব্যবসায়ে ব্যস্ত।

দুটি হাত রেলিংয়ে রেখে ক্ষিতীশ দিঘির অন্ধকার জলের দিকে তাকিয়ে। জুপিটারের ঠিক উলটোদিকেই অ্যাপোলোর ক্লাববাড়ি। ডাইভিং বোর্ডের কংক্রিট কাঠামোর থামগুলো অন্ধকারে ব্রহ্মদত্যির পায়ের মতো জল থেকে উঠেছে।

''ক্ষিদ্দা!''

চমকে পিছনে তাকাল ক্ষিতীশ।

''ভেলো!''

''কী হলো ক্ষিদ্দা?''

''কী আবার হবে, ছেড়ে দিলুম।''

''ভালোই করেছ। ঝগড়াঝাটি, গোলমাল হয়নি তো?''

''না।''

ক্ষিতীশ মুখটা আবার জলের দিকে ঘোরাল। হাওয়া বয়ে আসছে জলের উপর দিয়ে। বাতাসে জলের কণা, আর শ্যাওলা আর ঝাঁঝির আঁশটে গন্ধ। পঁয়ত্রিশ বছর এই শুঁকে আসছে ক্ষিতীশ। তার কাছে এর থেকে সুবাস পৃথিবীতে নেই।

ভেলো পাশে এসে দাঁড়াল।

''ভেলো, কী করি এখন বলতো রে। একেবারেই বেকার হয়ে গেলুম।''

''এবার প্রজাপতিকে বরং দেখাশুনা করো। বউদি একা মেয়েমানুষ, অন্যরাও মেয়ে, পুরুষমানুষ একজন থাকা দরকার। কখন কী মুশকিলে ওরা পড়ে যাবে তার ঠিক কী!''

''তোর বউদি মানুষটি ছোট্টখাট্ট, কিন্তু আমার থেকে দশগুণ লম্বা কাজের বেলায়। প্রজাপতিতে দারোয়ানি ছাড়া আমায় দিয়ে আর কোনো কাজ হবে না।''

''তাহলে?''

ক্ষিতীশ আবার জলের দিকে তাকিয়ে রইল।

''ক্ষিদ্দা, যদি রাগ না করো তো একটা কথা বলি।''

ক্ষিতীশ মুখ ফেরাল।

''তুমি অ্যাপোলোয় চলো।''

''না, ওরা জুপিটারের শত্রু। কতকগুলো স্বার্থপর লোভী মূর্খ আমায় দল পাকিয়ে তাড়িয়েছে বলে শত্রুর ঘরে গিয়ে উঠব?''

''কিন্তু ওখানে তুমি জল পাবে, শেখাবার ছেলেমেয়ে পাবে, কাজ চাইছ কাজ পাবে। অপমানের শোধ তোমায় নিতে হবে। শত্রু-মিত্র বাছবিচার করে কী লাভ?''

ক্ষিতীশ বিব্রতমুখে চুপ করে রইল। তার মনের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে সেটা তাকে এই মুহূর্তে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসতে দিচ্ছে না। জুপিটারের সঙ্গে তার নাড়ির সম্পর্ক, কিন্তু সাঁতারু তৈরি করা তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, ব্রত। লক্ষ্যপূরণ করতে হলে নাড়ির বাঁধন ছিঁড়ে বেরোতেই হবে। কিন্তু তা কি সে পারবে? ক্ষিতীশ মাথাটা ঝাঁকাল।

''তাহলে হেদো কিংবা গোলদিঘির কোনো ক্লাবে চলো।''

''কোথাও গিয়ে আমি টিকতে পারব না রে।'' ক্ষিতীশ হাঁটতে শুরু করল একটু জোরেই।

''চুপচাপ বসে থাকবে?'' ভেলো হ্যাঁচকা দিয়ে প্যান্ট টেনে তুলে ক্ষিতীশের পাশাপাশি থাকার জন্য প্রায় ছুটতে শুরু করল।

''আমি এবার সত্যিকারের কাজ করতে চাই। সবাইকে দেখিয়ে দেবো একবার। চ্যাম্পিয়ন তৈরি করব আমি। গড়ব আমি মনের মতো করে। একবার, শুধু একবার যদি তেমন কারুর দেখা পাই।''

মাথা নীচু করে ক্ষিতীশ হনহনিয়ে কমলদিঘির গেট থেকে বেরিয়ে রাস্তার ভিড়ে মিশে গেল। ভেলো কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে গেটের পাশে দাঁড়ানো আলুকাবলিওলাকে বলল, ''জাস্তি ঝাল দিয়ে চার আনার বানাও।''

সকাল আটটা প্রায়।

ক্ষিতীশ বাজার করে ফিরছে। জুপিটারে আর সে যায় না। সকাল-বিকাল এখন তার কোনো কাজ নেই। অবশ্য বাজার করাটা তার নিত্যদিনের কাজগুলির অন্যতম। সে বাজারে যায় বাড়ির কাছের বস্তির সরু গলি দিয়ে, ফেরে সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যুতে চিলড্রেনস পার্কটাকে ঘুরে অন্য পথ ধরে।

আজ ফেরার পথে দেখল পার্কে খুব ভিড়। বিশ্রাম চালাটায় টেবিল চেয়ার পাতা। লাউডস্পিকারে হিন্দি ফিল্মের গান বাজছে। হঠাৎ বন্ধ করে ঘোষণা হলো — ''নেতাজি বালক সঙ্ঘের উদ্যোগে কুড়ি ঘণ্টা অবিরাম ভ্রমণ প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে কাল রাত আটটায়। শেষ হবে আজ বিকেল চারিটায়।''

লাউডস্পিকারে অন্য একটা চাপা গলা শোনা গেল : ''এই শালা, চারিটায় কি রে, বল্ চার ঘটিকায়। অ্যালাউনস করতে হলে শুদ্ধু করে বলতে হয়।''

''যা লেখা আছে তাই তো পড়ছি।''

''দে দে, আমাকে মাইক দে।''

এরপর অন্য এক কণ্ঠে শোনা গেল: ''পতিযোগিতা শুরু হইয়াছে কল্য রাত্রি আট ঘটিকায়, উদ্বোধন করেন অতীতদিনের খ্যাতকীর্তি ফুটবল খেলোয়াড় শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ মাইতি। প্রতিযোগিতা সমাপ্ত হইবে অদ্য বৈকাল চারি ঘটিকায়। পুরস্কার বিতরণ করিবেন সন্ধেয় জননেতা ও আমাদের সঙ্ঘের প্রধান পিষ্টপোষক শ্রীবিষ্টুচরণ ধর মহাশয়। পতিযোগিতায় নেমেছিল বাইশজন পতিযোগী, আটজন অবসর নিয়েছে ইতিমধ্যে।''

ক্ষিতীশের চোখ হঠাৎ আটকে গেছে কঞ্চির মতো লম্বা, নিকষকালো একটি চেহারাতে।

গোলাকৃতি পার্কটিকে ঘিরে রেলিং। তার থেকে ছয় হাত ভিতরে সিমেন্টের পথটা বেড় দিয়েছে মধ্যস্থলের ঘাসের জমিকে। প্রতিযোগীরা পথ ধরে হাঁটছে ক্লান্ত, মন্থরগতিতে। অধিকাংশেরই বয়স ১৬-১৭। বৈশাখের ভয়ংকর রোদ মাথায় নিয়ে, তপ্ত সিমেন্টের ওপর ওদের সারা দুপুর হাঁটতে হবে।

পরনে ঢিলে ফুল প্যান্ট, ঢলঢলে বুশ শার্ট, পায়ে হাওয়াই চটি। চুলটা ছেলেদের মতো হলেও, ঘাড়ের কিনারে পৌঁছে গেছে। রাস্তার মাঝ থেকে ক্ষিতীশ রেলিংয়ের ধারে সরে এল।

ক্ষিতীশের চোখ অনুসরণ করতে লাগল শুধু একজনকেই। পার্কের মধ্যে শিশু ও বালকদেরই ভিড়। বয়স্করা রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে শুধুমাত্র ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে চলে যাচ্ছে। প্রতিযোগীদের চোখে রাত্রি জাগরণ, ক্লান্তি আর ক্ষুধার ছাপ। পার্কের চক্কর প্রায় ৭৫ মিটারের। ওদের কেউ কেউ চেনা লোকেদের দেখে শুকনো হাসছে, দু-চারটে কথা বলছে। গঙ্গায় সাঁতারের সঙ্গী সেই তিনটি ছেলে পার্কের মধ্যে ঘাসের উপর দিয়ে কোনির পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে ওর সঙ্গে কথা বলল। কোনি হাত নেড়ে ওদের চলে যেতে বলছে। চটিজোড়া খুলে পথের পাশে রাখল। উদ্যোক্তাদের দেওয়া লজেঞ্জস্ পকেট থেকে বার করে ওদের তিনজনকে দিয়ে, একটা মুখে পুরল। হাঁটতে হাঁটতে সে মুখের কাছে হাত তুলে জলপানের ইশারা করতেই নেতাজি বালক সঙ্ঘের একজন ছুটে গিয়ে তাকে এক গ্লাস জল দিয়ে এল। তিন-চার চক্করের পর আবার সে চটি পরল।

ক্ষিতীশের হুঁশ ফিরল যখন তার প্রতিবেশী অমূল্যবাবু অফিস যাবার পথে দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, ''কী দেখছেন ক্ষিতীশবাবু, বাঙালিদের ক্রীড়াচর্চা?''

লোকটিকে ক্ষিতীশ একদমই পছন্দ করে না, শুধুই নাটকীয় ঢঙে বাঁকা বাঁকা কথা বলে।

''কী আর করবে বলুন, আমরা ওদের ক্রীড়াচর্চার জন্যে কিছু ব্যবস্থা তো করে দিইনি। ওরা ওদের মতোই যা হোক ব্যবস্থা করে নিয়েছে।''

কথায় কথা বাড়ে। তাই ক্ষিতীশ আর না দাঁড়িয়ে বাড়িমুখো হলো।

সদর দরজা তালাবন্ধ। লীলাবতী বেরিয়েছে। অবশ্য দ্বিতীয় চাবি ক্ষিতীশের কাছে আছে। ঘড়ি দেখে সে জিভ কাটল। প্রায় পঞ্চাশ মিনিট দেরি হয়েছে, অর্থাৎ লীলাবতী এতই রেগেছে যে রান্না না চাপিয়েই বেরিয়ে গেছে।

ক্ষিতীশ রান্নার উদ্যোগ শুরু করল। আনাজ কুটতে বসে বারবার তার ইচ্ছে করল পার্কে গিয়ে কোনিকে দেখতে। এই দ্বিতীয়বার সে ওকে দেখলে।

অবিরাম হাঁটা ব্যাপারটা সে একদমই পছন্দ করে না। এতে বুদ্ধির দরকার হয় না আর বলদের মতো শুধু পাক খাওয়া। স্পিড দরকার হয় না, পেশির জোর লাগে না, পাল্লা দিতে হয় না আর একটা মানুষের সঙ্গে। একে স্পোর্ট বলতে ক্ষিতীশের ভীষণ আপত্তি।

একবার সে গোলদিঘিতে চিৎকার করে তার আপত্তিটা জানিয়েছিল ৯০ ঘণ্টা সাঁতার কেটে বিশ্বরেকর্ড লাভে প্রয়াসী এক সাঁতারুকে। ''ওরে বুদ্ধু, এখনো যে একটা ওলিম্পিক মেডেল সাঁতার কেটে আমরা পাইনি আর এসব বুজরুকি দেখিয়ে রেকর্ড করে কি তুই দেশের মান বাড়াবি?''

ক্ষিতীশকে জনাচারেক চেনা লোক টেনে সরিয়ে না দিলে হয়তো সে তখুনি জলে ঝাঁপিয়ে সম্ভাব্য বিশ্ব রেকর্ডটিকে তছনছ করে দিত। তবে সে এইটুকু মাত্র মানে, এইসব অবিরাম ব্যাপারগুলোর মধ্য দিয়ে কার কেমন সহ্যশীলতা কেমন একগুঁয়েমি সেটা বোঝা যায়। কিন্তু কী লাভ তাতে হয় যদি না সুশৃঙ্খল ট্রেনিং আর টেকনিকের মারফত সেগুলো বড়ো কাজে লাগানো হয়!

অপচয়। ক্ষিতীশ এইসব অপচয় দেখে বিরক্ত বোধ করে। খুব বিরক্ত বোধ করে। কিন্তু এখন সে ছটফট করছে পার্কে যাবার জন্য। উঠে গিয়ে ঘড়ি দেখল। হিসেব কষে বার করল, কোনি প্রায় চোদ্দো ঘণ্টা হাঁটছে। এখনো ছ-ঘণ্টা বাকি। ভয়ংকর এই শেষের ছ-ঘণ্টা। টিকতে পারবে কি!

কুকারে রান্না চাপিয়ে ক্ষিতীশ দরজায় তালা এঁটে আবার বেরিয়ে পড়ল।

পার্কে দর্শকদের সংখ্যা ক্ষীণ। গাছের ছায়ায় কিছু আর বিশ্রাম-চালায় উদ্যোক্তারা। কোনি হাঁটছে, মাথায় ছেঁড়া বেতের টুপি। ক্ষিতীশ গুনে দেখল ওরা তেরোজন। একজন বসে গেছে। পার্কে ঢুকে সে একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়াল। কোনি যখন সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে তখন সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। কোনির গাল বেয়ে ঘাম গড়িয়ে চিবুকে চোখ দুটি বসে গেছে, গালের উঁচু হাড় দুটো আরো উঁচু, ঠোঁটের চামড়া শুকনো। কিন্তু মাথাটা তুলে যেভাবে পাতলা দেহটাকে সে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাইতে ক্ষিতীশের মনে হলো, আকাশ থেকে আগুন ঝরলেও কোনির চলা থামবে না।

কেন মনে হলো, ক্ষিতীশ তা ব্যাখ্যা করতে পারবে না। শুধু এইটুকুই সে বলবে, একটা লোক নিজের সম্পর্কে কী ভাবে, সেটা বোঝা যায় চলার সময় মাথাটা সে কেমনভাবে রাখে তাই দেখে।

ক্ষিতীশ বাড়ি ফিরল বারোটায়। লীলাবতী কথা বলছিল দোকানের দুটি মেয়ের সঙ্গে। ক্ষিতীশ দাঁড়িয়ে গিয়ে বলল, ‘‘হাতিবাগানের ঘর কী হলো?’’

‘‘অনেক টাকা সেলামি চায়। সম্ভব নয়।’’

সে ঘরে ঢুকে গেল। অন্যমনস্কের মতো স্নান ও খাওয়া সেরে সে ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে লাগল। তিনটে বাজার সঙ্গে সঙ্গে আবার বেরিয়ে পড়ল।

তেরো থেকে আট, বসে গেছে পাঁচজন। পার্কে এখন বেশ ভিড়। লাউডস্পিকার রেকর্ড বাজানো বন্ধ করে নানাবিধ ঘোষণায় মত্ত। তারই মাঝে প্রতিযোগীদের জানিয়ে দেওয়া হলো, আর মাত্র পঞ্চাশ মিনিট বাকি।

কোনি হাঁটছে। ক্ষিতীশ জানতো ও হাঁটবে এবং শেষ করবে। ক্লান্তি ওর পদক্ষেপে ধরা পড়ছে। সকালের সেই তিনটি ছেলে ওর পাশাপাশি ঘাসের উপর দিয়ে চলছে। কোনি দু’একবার ওদের কথা শুনে হাসল। ক্ষিতীশ লক্ষ করল ডান পা-টা টেনে টেনে হাঁটছে। অন্য প্রতিযোগীদের মধ্যে দুটি বছর দশেকের ছেলে, বেশ তাজাই দেখাচ্ছে।

‘‘আমাদের আজকের সভাপতি বরেণ্য জননেতা ও এই সঙ্ঘের হিতৈষী শ্রীযুৎ বিষ্টুচরণ ধর মহাশয় তার শত কাজ ফেলে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন। এজন্য আমরা গর্বিত।’’

ক্ষিতীশ লাউডস্পিকার থেকে কান সরিয়ে চোখ পাঠাল চালার নীচে। সেখানে টেবিলের উপরে ইতিমধ্যে একটি সাদা চাদরের ও তোড়াভরা দুটি ফুলদানির আবির্ভাব ঘটেছে। তার পিছনে বসে আজকের সভাপতি।

আরে, এ তো গঙ্গার ঘাটে দেখা সেই হিপোটা! ক্ষিতীশ অবাক হয়ে গেল।

‘‘আর কুড়ি মিনিট বাকি প্রতিযোগিতা শেষ হতে। তারপরই পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান।’’

লাউডস্পিকারে ফিসফাস আলোচনা শোনা গেল। ‘‘বলতে ভুল হয়ে গেছে, পুরস্কার বিতরণের আগে সভাপতি মহাশয় তার ভাষণ দেবেন।’’

আটজনেই শেষ করল প্রতিযোগিতা। পার্কে হাজির প্রায় একশো শিশু, বালক ও বয়স্ক ভিড় করে দাঁড়াল চালার সামনে। ক্ষিতীশও এগিয়ে গেল।

তার চোখ খুঁজতে খুঁজতে কোনিকে পেল। সিমেন্টের সিঁড়ির ধাপে বসে পা ছড়িয়ে দু-হাতে টিপছে ডান ঊরু।

‘‘ওরে বাব্বা, আর আমি হাঁটার রেসে নামছি না। দুর্ দুর্ ফাস সেকেন থাড নেই।’’

‘‘তোকে তো পই পই বলেছিলুম, নাম দিস না। আমি আর ভাদু একবার নেমেই টের পেয়ে গেছলুম, বোগাস ব্যাপার।’’

‘‘কান্তি যে বলেছিল, লোকেরা এসে পিন দিয়ে টাকা আটকে দেয় জামায়, কই দিল না তো!’’

‘‘এসব ছোটোখাটো কম্পিটিশনে দেয় না।’’

"তোকে বলেছে! কোনি যদি ফ্রক পরে নামতো দেখতিস, অন্তত বিশ-পঁচিশ পেয়ে যেত। প্যান্ট শার্ট পরলে তো ওকে ছেলে দেখায়।"

"ঘোড়ার ডিম দিত, এখানকার লোকেরাই কঞ্জুস।"

"না রে, ঠিকই বলেছে ভাদুটা, আমাকে প্যান্ট পরলে ছেলেদের মতোই তো দেখায়। এই দ্যাখ তো চুন্ডু, প্রাইজ-ফ্রাইজ কী দেবে, পুরো একদিন বাড়ির বাইরে, মা মেরে ফেলবে যদি কিছু হাতে করে না নিয়ে যাই।"

লাউডস্পিকারে আনুষ্ঠানিক ঘোষণাগুলি শেষ হয়েছে। সভাপতি বিষ্টু ধর বক্তৃতা দিতে শুরু করেছে।

ক্ষিতীশ হাত পাঁচেক দূরে দাঁড়িয়ে কোনিদের কথাবার্তা শুনছিল। এবার সে এগিয়ে এসে বলল, "তুমি সাঁতার শিখবে?"

মুখটা তুলল সে। কাঁচা-পাকা কদমছাঁট চুলে ভরা মাথা আর পুরু লেনসের পিছনে জ্বলজ্বলে দুটি চোখের দিকে একটু বিরক্তভরেই তাকাল। তারপর আবার সে নিজের পা টিপতে লাগল।

"শিখবে সাঁতার?"

"সাঁতার আমি জানি।"

"না, জানো না।"

ঝটকা দিয়ে চুল ঝাঁকিয়ে কোনি আবার মুখ তুলল।

"আপনি জানেন?"

"হ্যাঁ জানি। আমি দেখেছি তোমায় গঙ্গায়। ও সাঁতার চলবে না। সাঁতার শেখার জিনিস।"

‘‘যা জানি তাতেই গঙ্গা এপার-ওপার করতে পারি, শেখার আবার আছে কী?’’

‘‘অনেক কিছু শেখার আছে।’’

‘‘আমার দরকার নেই শিখে, যা জানি তাই যথেষ্ট।’’

ক্ষিতীশের উপস্থিতিকে অগ্রাহ্য করে কোনি দাঁড়াল। চেঁচিয়ে ডাকল, ‘অ্যাই গোপলা শুনে যা।’’

টেবিলে স্তূপীকৃত নানাবিধ প্রাইজগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকা খালি পা, ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে বছর বারোর একটি ছেলে এগিয়ে এল।

‘‘হ্যাঁ রে, মা কিছু বলেছে?’’

‘‘যাও না বাড়িতে, পিটিয়ে তোমার চামড়া তুলে নেবে।’’

‘‘দাদা?’’

‘‘দাদা আজ কাজে যায়নি, জ্বর হয়েছে। মার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে তোমাকে নিয়ে। দাদা বলেছে, বেশ করেছে কোনি।’’

ক্ষিতীশ ভাবল, আর একবার কোনির সঙ্গে কথা বলবে। কিন্তু ততক্ষণে কোনিকে ডেকে নিয়ে গেছে নেতাজি বালক সঙ্ঘের কর্মকর্তারা। প্রতিযোগীদের হাতে একটি করে খাবারের ঠোঙা দেওয়া হচ্ছে।

‘‘এই যে শরীর, একে চাকর বানাতে হবে।’’

ক্ষিতীশ ফিরে তাকাল বক্তৃতাকারীর দিকে। মাইক্রোফোনের পিছনে একটি ধুতি-পাঞ্জাবি পরা চর্বির ঢিপি। ক্ষিতীশ ভিড় কেটে চাতালের দিকে এগোল।

‘‘কী করে তা সম্ভব? আপনার লক্ষ লক্ষ টাকা আছে কিন্তু পারেন কি আপনি আর্চ করতে, পিকক্ হতে? যদি কেউ আপনাকে চাঁটি মেরে পালায়, পারবেন কি তাকে দৌড়ে গিয়ে ধরতে? না, পারবেন না, আমি জানি আপনি পারবেন না।’’

সভাপতির পিছন থেকে কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ‘‘একবার পরীক্ষা করে দেখব নাকি?’’

বিষ্টু ধর পিছন দিকে তাকাল। ক্ষিতীশকে দেখে ভ্রূ কোঁচকাল। মাইকে হাত চাপা দিয়ে চাপা গলায় বলল, ‘‘সব জায়গায় ইয়ারকি করবেন না।’’ তারপর হাত সরিয়ে বলতে শুরু করল, ‘‘কেন পারবেন না, জানেন কি কারণটা?’’ কারণ, আপনার শরীর ফিট নয়। আর ফিটনেস আসে নিয়মিত ব্যায়াম থেকে।’’

বিষ্টু ধর পিছন ফিরে তাকাল। ক্ষিতীশ মাথা হেলিয়ে তারিফ জানাল।

‘‘ব্যায়াম সেইজন্যই সকলের করা দরকার। হাঁটাও একটা ব্যায়াম। তাই নেতাজি বালক সঙ্ঘের তরুণ কর্মীদের, যারা দিনরাত পরিশ্রম করে আজকের এই প্রতিযোগিতাকে সফল করে তুলেছে, তাদের বললাম তোমরা হাঁটার ব্যবস্থা করো, আমি আছি তোমাদের সাথে। এটা সমাজসেবার কাজ, আমি থাকব তোমাদের পাশে পাশে।’’

‘‘উঁহু, আগে আগে। নেতৃত্ব দিতে হলে সামনে থাকতে হয়।’’

বিষ্টু ধর পিছনে তাকিয়ে ভ্রূ কোঁচকাল। তারপর মাথা হেলাল, ‘‘পাশে পাশেই বা বলি কেন, আমি থাকব আগে আগে। সমাজের কল্যাণের জন্য মানুষকে সুস্থ সবল করার জন্য যখনই সংগঠন গড়ে উঠবে, সবার আগে আমাকে ছুটে আসতেই হবে।’’

‘‘ছোটার কথা চেপে যান।’’ পিছন থেকে ফিসফাস শোনা গেল, ‘‘যদি কেউ বলে একটু ছুটে দেখান!’’

বিষ্টু ধর ঢোঁক গিলে বলল, ‘‘কিন্তু ছুটেই বা আসব কেন! মানুষ ছোটে কখন? যখন সে ভয় পায়, দিশাহার হয়। কিন্তু জনগণ সহায় থাকলে আমি ভয় পাব কেন? জনগণই পথ বলে দেবে, সুতরাং দিশাহারা হব কেন? না, আপানাদের আশীর্বাদ থাকলে আমি ভয় পাব না। সঠিক পথেই আপনাদের সেবা, দেশের ও দশের সেবা করে যেতে পারব। তাই আজ প্রতিযোগীদের এই কথা বলেই বক্তব্য শেষ করব, শরীরটাকে ফিট না করলে পরিশ্রম করতে পারবে না। পরিশ্রম না করলে দেশ গড়ে তুলতে পারবে না। তাই আজ যে প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে তোমরা হাঁটা শুরু করলে .....’’

বিষ্টু ধর পকেটে হাত ঢুকিয়ে হাতড়াতে লাগল। ''এই যে হাঁটা, এ হাঁটা জীবনের পথে.....''

বিষ্টু ধর অসহায়ভাবে পিছনে তাকাল।

''ভুলে গেছেন?''

ঘাড় নেড়ে অসহায়ভাবে বিষ্টু ধর ফিসফিস করে বলল, ''রবি ঠাকুরের একটা পদ্য লিখে এনেছিলুম, পাচ্ছি না।''

''বলুন এই যে যাত্রা শুরু হলো ছোট্ট এই পার্কে —''

মাইক্রোফোনে গম্‌গম্ করে উঠল সভাপতির আবেগভরা কণ্ঠ, ''এই যে যাত্রা শুরু হলো, ছোট্ট পার্কে —''

''ধীরে ধীরে তা বৃহত্তর জীবনের দিকে, সুখ-সমৃদ্ধিভরা জীবনের দিকে তোমাদের নিয়ে যাক। এই পার্ক পরিক্রমা রূপান্তরিত হোক বিশ্ব পরিক্রমায়, জয় হিন্দ।''

বিষ্টু ধর হুবহু বলে গেল ক্ষিতীশের প্রম্পট্ শুনে। শুধু জয় হিন্দের পর গলা কাঁপিয়ে যোগ করল, ''ইনকিলাব জিন্দাবাদ।''

পুরস্কার দেওয়া হলো; প্লাস্টিকের কিট ব্যাগ আর তোয়ালে পেল যারা ২০ ঘণ্টা সম্পূর্ণ করেছে। ১৬ ঘন্টার পরে যারা অবসর নিয়েছে তাদের শুধুই ব্যাগ আর ১২ ঘণ্টার পরে যারা তাদের তাদের শুধুই তোয়ালে। কোনি পুরস্কার নিয়ে ব্যাগটা উলটেপালটে দেখল। সভাপতিকে নমস্কার জানানোর দরকারও মনে করল না। খাবারের ঠোঙাটা ব্যাগের মধ্যে ভরে সে ভাইয়ের হাতে দিয়ে বলল, ''চ বাড়ি যাই, এটা মাকে দিতে হবে।''

ভাইয়ের কাঁধে হাত রেখে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোনি চলে যাচ্ছে।

ক্ষিতীশ একদৃষ্টে তাকিয়ে। মাথাটা উঁচু, কঞ্চির মতো শরীরটা দুলছে। সঙ্গে ওর বন্ধু ভাদু আর চণ্ডু। পার্ক থেকে বেরিয়ে ওরা ধীরে ধীরে দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে। ক্ষিতীশের মনে হলো, ওর বাড়ির ঠিকানাটা নিয়ে রাখলে হতো।

''আপনাকে বেষ্টাদা ডাকছে।''

''কে বেষ্টাদা?'' অন্যমনস্ক ক্ষিতীশ বলল।

''আজ যিনি সভাপতি।''

ক্ষিতীশকে দেখেই বিষ্টু ধর একগাল হেসে বলল, ''ফিনিশিংটা, সবাই বলছে দারুণ হয়েছে।'' তারপর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল, ''ইনকিলাব জিন্দাবাদটা অ্যাড্ করলুম, তার কারণ আছে। আমার প্রগ্রেসিভ নেচারটা বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। চলুন চলুন, আমার গাড়ি রয়েছে, আপনাকে সব বলছি, আমার বাড়ি চলুন।''

বিষ্টু ধর আগামী নির্বাচনে দাঁড়াবে। তাই এখন থেকেই সে তোড়জোড় শুরু করেছে। পাড়ায় পাড়ায় নানান ব্যাপারে টাকা দিয়ে অনুষ্ঠান করাচ্ছে আর তাতে সভাপতি হয়ে বক্তৃতা দিচ্ছে। নির্দলীয় সমাজসেবক হিসাবে সে ভোট চাইবে।

বিষ্টু ধর গাড়িতে বসে কথাগুলো জানিয়ে দিল।

বাড়ি পৌঁছে বলল, ''আপনাকে আমার দরকার।''

''আমাকে!''

''হ্যাঁ, আপনি আমার ইস্পিচ-রাইটার হবেন, বক্তৃতা লিখে দেবেন। অবশ্য এজন্য টাকা দেবো। রাজি?''

''আমি তো খেলার ব্যাপার ছাড়া আর কিছু জানি না!'' ক্ষিতীশ বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাতে সামলাতে বলল।

''সেইজন্যেই তো আপনাকে চাই। খেলা নিয়েই বক্তৃতা দিতে চাই, আর কিছু নিয়ে নয়। বিনোদ ভড় হচ্ছে সিটিং এম এল এ। খেলার লাইনের লোক। অনেক ক্লাবের প্রেসিডেন্ট। আমিও খেলার লাইন ধরে ক্যাম্পেন করব। বিনোদ ভড় মিনিস্টার হতে চায়।''

সিঙারা মুখে দিয়ে ক্ষিতীশ বলল, ''ভেবে দেখি।''

রবীন্দ্র সরোবরে এক মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতা।

পঁচিশজন প্রতিযোগী। বাইশটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে।

স্টারটিং পয়েন্টে ভিড়। প্রতিযোগীরা তেল মাখায় ব্যস্ত। উদ্যোক্তা ঢাকুরিয়া স্পোর্টস ক্লাবের অনুরোধে ক্ষিতীশ প্রতিযোগিতার রেফারি অফ দ্য কোর্স। সাঁতারুদের সঙ্গে সঙ্গে যাবে নৌকোয়।

স্টারটিং পয়েন্ট থেকে একটু এগিয়ে সে আর ভেলো নৌকোয় বসে।

''ক্ষিদ্দা, কে জিতবে বলো তো? সুবীরই মনে হচ্ছে।''

''সুবীরের নামা অন্যায় হয়েছে। এসব কম্পিটিশনে নামীদের থাকা উচিত নয়। ও তো ন্যাশনাল জুনিয়ার রেকর্ড হোল্ড করছে।''

''যা বলেছ। তবে বেশির ভাগই আনকোরা দেখছি।''

ভেলো সারি দিয়ে দাঁড়ানো সাঁতারুদের পর্যবেক্ষণ করতে করতে বলল, ''ওই লাল কস্ট্যুমপরা মেয়েটা কে বলো তো? কখনো তো দেখিনি!''

এত দূর থেকে ক্ষিতীশ, পুরু লেনসের মধ্য দিয়ে, সাদা টুপি মাথায়, লাল রঙে মোড়া তুষারধবল একটি দেহমাত্র দেখতে পেল।

''কে, তা আমি জানব কী করে!''

''না, এমনিই বলছি। বালিগঞ্জ ক্লাবের ট্রেনার প্রণবেন্দু বিশ্বাসকে দেখলুম কিনা মেয়েটার সঙ্গে। খুব বড়লোক মনে হলো। ওই যে সবুজ মোটরটা, ওটায় করে এসে নামল। সঙ্গে বাবা-মাও যেন রয়েছে।''

''তুই বড্ড বেশি দেখিস।''

''না দেখে উপায় আছে, মোমের পুতুলের মতো চেহারা! ওর পাশেই দ্যাখো, পোড়ামাটির কেলে পিলসুজের মতো একটা। কী অদ্ভুত দেখাচ্ছে দ্যাখো।''

ক্ষিতীশ দেখার চেষ্টা করল। সেকেন্ড কয়েক তাকিয়ে থেকে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল একটা শব্দ, ''কোনি!''

ঠিক তখনই স্টার্টারের বন্দুক গর্জে উঠল।

সাঁতারুরা এগিয়ে যাবার পর ক্ষিতীশদের নৌকোটা পিছু নিল।

সুবীর এবং আরো গুটি দশেক ছেলে একঝাঁকে এগিয়ে গেছে। তারপরেও আর এক ঝাঁক। সব শেষে তিনটি মেয়ে ও দুটি বাচ্চা ছেলে।

পাঁচশো মিটার পর্যন্ত এরা পাঁচজন প্রায় একসঙ্গেই ছিল। তারপরই লাল কস্ট্যুম ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে শুরু করল।

''ক্ষিদ্দা, স্ট্রোক দেখেছ! শরীরটাকে কেমন ভাসিয়ে রেখেছে!''

ক্ষিতীশ কিছুক্ষণ লক্ষ করে বলল, ''মাথাটা ঠিকমতো নাড়ানো হচ্ছে না। সেন্ট্রাল পোজিশনে না থাকলে শরীরের ব্যালান্স নষ্ট হয়, স্পিডও কমিয়ে দেয়; শরীরটা রোল করছে বড্ড বেশি। কনুই আরো উঠবে...''

“অ্যাই অ্যাই, অমনি তোমার শুরু হয়ে গেল খুঁত ধরা।”

“খুঁত না ধরলে দোষ সারবে কী করে!”

“ও কি তোমার ছাত্তর?”

“নাইবা হলো।”

সামনের দু-ঝাঁকের সাঁতারুদের কেউ কেউ এবার মন্থর হয়ে পিছিয়ে পড়ছে। ক্ষিতীশ ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাল। বাচ্চা ছেলে দুটির সঙ্গে কোনি আসছে বৈঠার মতো হাত চালিয়ে, দু-ধারে মাথা নাড়াতে নাড়াতে। ওদের থেকে অন্তত কুড়ি মিটার সামনে আর একটি মেয়ে, সমান তালে একই গতিতে সাঁতরে চলেছে। লাল কস্ট্যুমের মেয়েটি তার থেকে আরো তিরিশ মিটার সামনে এবং একটি ছেলের থেকে হাত দশেক পিছনে।

“কো ও ও নি ই ই।”

সরোবরের পূর্ব তীর থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল।

ক্ষিতীশ আর ভেলো একসঙ্গেই তাকাল, বছর পঁচিশের, শ্যামবর্ণ একটি রুগ্ন যুবক পাড় ঘেঁষে ছুটছে। পরনে ধুতি ও নীল শার্ট। চটি জোড়া হাতে।

“কো ও ও নি ই ই... কো ও ও নি ই ই।”

গলার স্বরটা আর্তনাদের মতো শোনাচ্ছে। পাড়ে ভিড় জমেছে। সাঁতার দেখতে। তাদের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সে ছুটছে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ে তাকাচ্ছে। মুখখানি অসহায়।

“কো ও ও নি ই।”

চিৎকারটা হতাশায় ভেঙে পড়ল। ক্ষিতীশ দেখল কোনিকে পিছনে ফেলে বাচ্চা দুটি এগোচ্ছে। লাল কস্ট্যুম দুটি ছেলেকে পিছনে ফেলে দিয়েছে।

“কে বলো তো ক্ষিদ্দা?”

“জানি না, কোনো কম্পিটিটারের বাড়ির লোক হবে হয়তো।”

পাড়ের রাস্তা ধরে ধীর গতিতে সবুজ রঙের একটা ফিয়াট চলেছে। গাড়ির জানালায় উৎকণ্ঠিত একটি পুরুষ ও একটি মহিলার মুখ। মাঝে মাঝে হর্ন দিচ্ছে।

“কো ও ও ন্ ই ই।”

নৌকোটা ছপছপ শব্দে দাঁড় ফেলে এগোচ্ছে। একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে নীলশার্ট পরা যুবকটি দাঁড়িয়ে। ক্রমশ সে ক্ষিতীশের চোখে ছোটো হয়ে ঝাপসা হতে শুরু করল। জলের উপর, অনেক পিছনে দুটি হাতের ওঠানামা হচ্ছে। তারপর আর দেখা গেল না হাত দুটো। পড়ন্ত রোদে মাঝে মাঝে চিক্ চিক করে উঠছে ছিটকে ওঠা জল।

সামনে হই চই শোনা গেল। প্রথম প্রতিযোগী সাঁতার শেষ করেছে। সম্ভবত সুবীরই।

কোনি জল থেকে উঠছে। সাঁতার শেষ করে অনেকেই তখন চুল পর্যন্ত আঁচড়ে ফেলেছে। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে একজন ঢাকুরিয়া স্পোর্টিং ক্লাবের সারা বছরের কার্যকলাপের বিবরণ পাঠ করে চলেছে একঘেঁয়ে সুরে। কেউ লক্ষই করল না শেষ প্রতিযোগীর সীমায় পৌঁছানোটা।

পাড়ের কাছে কাদা। কোনির পায়ের গোছ কাদায় ডোবা, শরীরটা সামনে ঝোঁকানো, পাড়ে উঠতে গিয়ে সেই অবস্থাতেই সে তাকিয়ে রইল। চোখ দুটি লাল। সস্তার একটা কালো কস্ট্যুম শীর্ণ দেহের সঙ্গে লেপ্‌টে। হাঁপাচ্ছে, পিঠের দিকে পাঁজরের হাড়গুলো চামড়ার নীচে বারবার কেঁপে উঠছে। কাঁধের হাড় দুটো উঁচু; সরু লম্বা হাত দুটো ঝুলছে কাঁধ থেকে। একটু দূরে নীলশার্ট পরা রুগ্ন যুবকটি দাঁড়িয়ে, মনোযোগে লাউডস্পিকারে কান পাতার ভান করে।

টলতে টলতে কোনি উঠে এল। ওর বয়সিই দুটি ছেলে একটু জোরেই নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল।

''তবু তো শেষ করেছে।''

''পরের বছরের কম্পিটিশনে প্রথম প্লেস পেত যদি আর একটু দেরিতে পৌঁছত।''

কোনি আর একবার তাকাল। নীলশার্ট পরা যুবকটির মুখ চড় খাওয়া মানুষের মতো অপ্রতিভ, অপমানিত।

''সাঁতার শিখবে?''

চমকে কোনি পিছনে ঘুরল।

সেই লোকটা। কাঁচাপাকা কদমছাঁট চুল। পুরু কাঁচের চশমা।

''লাল কস্ট্যুমপরা মেয়েটি সাঁতার শিখেছে তাই তোমাকে হারাল। তুমিও ওকে হারাতে পারবে যদি শেখো।''

হঠাৎ কোনির দু'চোখ জলে ভরে এল। থরথরিয়ে ঠোঁট দুটি একবার কেঁপে উঠল। তারপরই চোয়াল শক্ত হয়ে বসে গেল।

ক্ষিতীশের চাহনির দপ করে ওঠা শুধু ভেলোই লক্ষ করল এবং অস্বস্তিভরে সে মাথা নাড়ল।

''ওই যে দাঁড়িয়ে, ও কে?''

''আমার দাদা।''

নিজেকে টানতে টানতে কোনি ড্রেসিংরুমের দিকে চলে গেল। ক্ষিতীশ এগিয়ে গেল কোনির দাদাকে লক্ষ করে।

''আমি একজন সাঁতারের কোচ। আমার নাম ক্ষিতীশ সিংহ। আমি আপনার বোনকে সাঁতার শেখাতে চাই।''

ক্ষিতীশ কোনো ভূমিকা না করে সোজাসুজি কথাগুলো বলল।

''আমার নাম কমল পাল। আমি একসময় সাঁতার কেটেছি অ্যাপোলোয়। তখন আপনাকে আমি দূর থেকে দেখতাম।'' কমল তার পাণ্ডুর অসুস্থ চোখ দুটোয় ঔজ্জ্বল্য আনার চেষ্টা করল। তারপর মাথা নাড়িয়ে বলল, ''আমরা খুবই গরিব। সাঁতার শেখবার পয়সা নেই।''

''আমাকে পয়সা দিতে হবে না।''

''তা বলছি না। সাঁতার শিখতে হলে খরচ আছে, খাওয়া-দাওয়ার খরচ। আমি পারিনি সেইজন্য, পয়সা ছিল না খাওয়ার। বাবা প্যাকিং কারখানায় কাজ করত, টি বি-তে মারা গেল। সাঁতার কেটে এসে খিদেয় ছটফট করতুম। স্কুলে ঘুমিয়ে পড়তুম। বাবা মারা যেতে স্কুল ছাড়লুম সাঁতার ছাড়লুম। আজ পাঁচ বছর হয়ে গেল।''

''কী করেন আপনি?''

''আপনি বললে লজ্জা পাব।''

''বেশ। তুমি কী করো, বাড়িতে আর কে কে আছেন?''

''সাত ভাই-বোন, মা। আমি বড়ো, গত বছর মেজো ভাই ট্রেনের ইলেকট্রিক তারে মারা গেছে, সেজো কাঁচরাপাড়ায় পিসির বাড়িতে থাকে। তারপর কোনি আর দু-বোন এক ভাই। আমি রাজাবাজারে একটা মোটর গ্যারেজে কাজ করি, ওভারটাইম করে শ' দেড়েক টাকা পাই, তাতেই সংসার চলে। থাকি শ্যামপুকুরে বস্তিতে।''

কমল হাঁপিয়ে পড়ল এই কটি কথা বলেই। ভিতরে ভিতরে যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। কোনো কুণ্ঠা বা সংকোচ না করে সাধারণভাবেই নিজেদের অবস্থার কথা বলল। ওর হাঁপিয়ে ওঠার ধরনটা ক্ষিতীশের ভালো লাগল না। ওর বাবা টি বি-তে মারা গেছে, এটা মনে পড়ে অস্বস্তি বোধ করল।

‘‘নামকরা সাঁতারু হবার সখ আমার ছিল। কোনিটাকে দেখতুম ছোটো থেকেই ওর খেলাধুলোয় আগ্রহ। আমার ইচ্ছে করে ওকে কোনো একটা খেলায় দিই। গঙ্গায় সাঁতার কাটে শুনেছি, দেখিনি কখনো। দিনরাত টো টো করে শুনেছি ছেলেদের সঙ্গে। অনেকে অনেক কথা বলে আমাকে। আমি তো বাড়িতে ফিরি শুধু ঘুমোবার জন্য। কে কী করছে কিছুই জানি না। তবু মাথা গরম হয়ে উঠলে দু-চার ঘা লাগাই। এর বেশি ওদের জন্য আমি আর কিছু করতে পারি না। ইচ্ছে থাকলেও ওকে সাঁতার শেখাবার সামর্থ্য আমার নেই।’’

‘‘সে দায়িত্ব আমার।’’

‘‘তার মানে?’’ ভেলো ব্যস্ত হয়ে এতক্ষণে মুখ খুলল। ‘‘দায়িত্ব তোমার মানে?’’

‘‘মানে বলতে যা বোঝায় তাই।’’ ক্ষিতীশ বিরক্তি জানিয়ে কমলকে লক্ষ করে বলল, ‘‘গার্জেনরা সাহায্য না করলে কোনো ছেলেমেয়েকে শুধু কোচিং দিয়ে বড়ো করা যায় না। আমি শুধু বাড়ির সহযোগিতাটুকু চাই। বাদবাকি দায়িত্ব আমার।’’

‘‘আপনি দায়িত্ব নেবেন, সে তো ভাগ্যের কথা।’’ কমলের চোখের পাণ্ডুরতা চকচক করে উঠল। ‘‘কিন্তু আমি এক পয়সাও খরচ করতে পারব না। ধার করে কালকেই বারো টাকা দিয়ে কস্ট্যুম কিনে দিয়েছি। খুবই বাজে জিনিস। কখনো ওর সাঁতার দেখিনি, এই প্রথম দেখলাম। কথা দিয়েছিল, মেয়েদের মধ্যে প্রথম হবেই। দেখলেন তো কী হলো!’’

ক্ষিতীশ ঘাড় নাড়ল।

ভেলো বলল, ‘‘স্ট্রেংথই নেই, আদ্দেকের পর আর টানতে পারছিল না। ওকে এখন খুব খাওয়াতে হবে। তাই না ক্ষিদ্দা?’’

‘‘আমরা এখন চলি।’’

ক্ষিতীশ পিছনে মুখ ঘুরিয়ে দেখল দূরে কোনি দাঁড়িয়ে। ফ্রক পরে। কাঁধে প্লাসটিকের ব্যাগ।

‘‘আমার খুবই ইচ্ছে, ও সাঁতার শিখুক, বড়ো হোক, নাম করুক।’’ তারপর ইতস্তত করে কমল বলল, ‘‘আর, যতটুকু পারি টেনেটুনে চালিয়ে খরচ করার চেষ্টা করব।’’

ওদিকে প্রাইজ দেওয়া হচ্ছে। নাম ডাকা এবং হাততালির শব্দ লাউডস্পিকারে ভেসে আসছে।

‘‘মেয়েদের মধ্যে প্রথম ......’’

ক্ষিতীশ তাকিয়ে ভাইবোনের দিকে। প্রাইজ না নিয়ে চলে যাচ্ছে উলটো-দিকের পথ ধরে। ভাঙা রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে গলে রাস্তায় পড়বে। কমল গলে বেরিয়েছে। কোনি কাত হয়ে মাথা নীচু করে। ঝটকা দিয়ে সে এবার ফিরে দাঁড়াল।

‘‘...বালিগঞ্জ সুইমিং ক্লাবের হিয়া মিত্র। টাইম — পঁয়ত্রিশ মিনিট আঠারো সেকেন্ড।’’

কোনি মাথা নামিয়ে রেলিংয়ের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে গেল।

‘‘তোমার কি মাথা খারাপ হলো নাকি ক্ষিদ্দা!’’

‘‘কী করে বুঝলি।’’

‘‘ওই পিলসুজমার্কা সিড়িঙ্গে, কেষ্ট তুলসীর মতো রং, খেতে পরতে পায় না, ওকে তুমি সাঁতার শেখাবে, আবার দায়িত্বও নেবে?’’

‘‘হ্যাঁ, তা না হলে কি শেখানো যায়?’’

‘‘দায়িত্ব, কথাটার মানে?’’

‘‘মানে, খাওয়া-পরার দায়িত্ব, মানসিক গড়ন, যেটা সব থেকে ইমপর্ট্যান্ট, তাই গড়ে তোলার দায়িত্ব, রেগুলার ট্রেনিং করানোর দায়িত্ব, এইসব আর কী।’’

‘‘তা হলে তো ওকে বাড়িতে এনে রাখতে হয়।’’

‘‘দরকার হলে রাখতে হবে। এককালে গুরুগৃহে থেকেই তো শিষ্যরা শিখতো। সিস্টেমটা খুব ভালো।’’

‘‘সিস্টেমের মধ্যে বউদির কথাটা মনে রেখেছো তো!’’

ক্ষিতীশ রেগে উঠে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। থেমে, কান পাতল লাউডস্পিকারে।

''কনকচাঁপা পাল, আন-অ্যাটাচ্‌ড্‌। কনকচাঁপা পাল।'' তারপর মৃদু ফিসফিস শোনা গেল, ''বোধহয় চলে গেছে। থাক্‌ রেখে দাও।''

ক্ষিতীশ দেখল, সবুজ ফিয়াটের ধারে লাজুক মুখে হিয়া দাঁড়িয়ে। আনন্দ ফেটে পড়ছে ওর দুই গালের টোলে। এক মহিলা বাক্সটা তুলে মেডেলটা দেখছে আর হাসছে। প্রণবেন্দু ওদের সঙ্গেই দাঁড়িয়ে। সুপুরুষ সুবেশ এক ভদ্রলোককে সে কী একটা বোঝাবার জন্য হাত পাড়ি দিয়ে বাটারফ্লাই স্ট্রোকের ভঙ্গি করল।

''সামনের বছর দেখা যাবে।'' নিজেকে উদ্দেশ করে আপন মনে ক্ষিতীশ বলল।

''কিছু বলছ ক্ষিদ্দা?''

ক্ষিতীশ জবাব দিল না।

''শেখাবে যে, জল কোথায়? জুপিটারে তুমি আর ট্রেনার নও। তাহলে মেয়েটাকে কোথায় নামিয়ে শেখাবে? অন্য ক্লাবে তোমায় যেতেই হবে।''

''না, আমি জুপিটারেই ওকে শেখাবে। দেখি কে আমায় আটকায়। তার আগে আমাকে রোজগারে নামতে হবে রে ভেলো। এখন আমার টাকা চাই। বিষ্টু ধরের সঙ্গে দেখা করা দরকার।''

ওরা তখন খেতে বসেছে।

হঠাৎ দরজায় ক্ষিতীশকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

''তোমাকে দরকার, একটু বাইরে এসো।''

কোনিকে লক্ষ্য করে, কথাগুলো বলে, সে দরজা থেকে সরে গেল। ওইটুকু সময়ের মধ্যেই সে দেখে নিয়েছে কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা, কাঁচা পেঁয়াজ, ফ্যান এবং সম্ভবত তার মধ্যে কিছু ভাত আছে আর তেঁতুল। পাঁচটি প্রাণী কলাই আর অ্যালুমিনিয়ামের থালা নিয়ে বসে। ঘরে একটা তক্তপোশ। তোশক নেই, শুধু চিটচিটে ছোটো কয়েকটা বালিশ। দেয়ালে টাঙানো দড়িতে কিছু ময়লা জামা-প্যান্ট। খোলার চালের এই ঘরে একটি মাত্র জানালা, যার নীচেই থকথকে পাঁকে ভরা নর্দমা।

কোনি কৌতূহলী চোখে বেরিয়ে এল।

''এই ফর্মটায় সই করে দাও, আর আজ বিকেলে আমার সঙ্গে জুপিটার ক্লাবে যাবে।''

ফর্মটা হাতে নিয়ে কোনি যেন কেমন এক ফাঁপরে পড়ল। ''কলম আছে আপনার কাছে?''

ক্ষিতীশের কাছে নেই।

''পেন্সিলে লিখলে হবে?''

''না, কালিতে সই করতে হবে।''

কোনি ছুটে গিয়ে কোথা থেকে কলম জোগাড় করে আনল। ক্ষিতীশের দেখিয়ে দেওয়া জায়গায় কলম বাগিয়ে সে জানতে চাইল, ''ইংরাজিতে না বাংলায়?''

"যা খুশি।"

ধরে ধরে, বিড়বিড়িয়ে বানান করে কোনি ইংরেজিতেই সই করল। সেটা দেখে ক্ষিতীশ বলল, "কোন ক্লাশে পড়ো?"

"ফাইভে"

"স্কুলে যাও?"

"নাম কেটে দিয়েছে।"

"আজ ঠিক চারটের সময় কমলদিঘির পশ্চিম দিকের বড়োগেটের মুখে দাঁড়িয়ে থাকবে। তোয়ালে, কস্ট্যুম সব নিয়ে যাবে।"

"তোয়ালে নেই।"

"আমি নিয়ে যাব। তুমি ঠিক সময়ে আসবে।"

ঠিক সময়েই কোনি হাজির ছিল। ক্ষিতীশ ওকে নিয়ে ক্লাবে ঢুকল। অফিস ঘরে হরিচরণ আর প্রফুল্ল বসাক। ক্ষিতীশ ফর্মটা প্রফুল্লের হাতে দিল। সেটা পড়ে প্রফুল্ল বলল, "সুইমার?"

"হ্যাঁ।"

"ট্রায়াল দিতে হবে।"

"তার মানে!" ক্ষিতীশ বিরক্ত হয়েই বলল, "আমি বলছি তাতে হবে না?"

"তা কী করে হয়! ক্লাবের একটা নিয়ম আছে তো। ট্রেনার যদি বলে তবেই সুইমার। যে-সে, যাকে-তাকে এনে সুইমার বলবে আর জলে নেবে যদি ডুবে যায় তখন আমরাই তো হাঙ্গামায় পড়ব।"

প্রফুল্ল কথাগুলো বলতে বলতে হরিচরণের দিকে তাকাল। জানালার বাইরে তাকিয়ে হরিচরণ তখন মুচকি হাসছে।

''যে সে! আমি তাহলে যে সে?'' ক্ষিতীশ বিড়বিড় করল থমথমে স্বরে। কোনি অবাক হয়ে দেখছে, দলে দলে ছেলেরা কস্ট্যুম পরে ক্লাব থেকে বেরোচ্ছে। তিন-চারটে মেয়েও আছে আর মধ্যে। বাইরে হই চই জলের ধারে 'নভিস' ছেলেদের।

''বেশ তাহলে ট্রায়াল নেওয়া হোক।''

হরিচরণ মুখ ফেরাল এতক্ষণে। কোনিকে আপাদমস্তক দেখে বলল, ''মেয়েটি কে?''

''আমার চেনা মেয়ে। গুড মেটিরিয়াল। স্ট্রোক শেখাতে হবে।''

''গুড মেটিরিয়াল!'' হরিচরণ ঠোঁট বেঁকিয়ে শব্দগুলো দুমড়ে মুখ থেকে বার করল। কোনিকে আর একবার দেখে নিয়ে, গম্ভীরস্বরে বলল, ''এ ক্লাবের কাউকে স্ট্রোক শেখাতে হলে, শেখাবে ক্লাবেরই ট্রেনাররা। কাল সকালে আসুক। বন্দনা কি টুনু ওর ট্রায়াল নেবে।''

ক্ষিতীশ কয়েক সেকেন্ড হরিচরণ ও প্রফুল্লর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ''আচ্ছা।''

বেরিয়ে এসে কোনি বলল, ''কী হলো, ভর্তি করাল না?''

''পরীক্ষা দিতে হবে। কোনি, আমাদের দুজনকেই পরীক্ষা দিতে হবে।''

কথাটা বুঝতে পারল না কোনি। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, ''দুজনকেই! কেন, আপনি সাঁতার জানেন না?''

''সাঁতার নয়, আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে অপমান সহ্য করার।''

ক্ষিতীশ জলের ধারের রেলিংয়ের দিকে এগিয়ে গেল। দুটি ক্লাবের প্রায় চারশো ছেলে কমলদিঘিতে দাপাদাপি করছে, কয়েকটি মেয়েও আছে। দুটো ডাইভিং বোর্ডে কয়েকটি ছেলে। তারা জলে লাফাচ্ছে নিছকই লাফাবার জন্য। বিষণ্ণচিত্তে ক্ষিতীশ মাথা নাড়ল। কাজের কাজ কেউই করছে না। সুহাস জলে নামছে। একবার সে তাকাল মাত্র তার দিকে।

হরিচরণ ক্লাব অফিসের জানালা থেকে চেঁচিয়ে বলল, ''সুহাস, দুটো ফোর হানড্রেড, তারপর হানড্রেড বাটারফ্লাই, ব্যাক অ্যান্ড ব্রেস্টস্ট্রোক ইচ, মনে আছে তো?''

সুহাস ঘাড় নাড়ল।

ক্ষিতীশ হাসল। মাত্র এগারোশো মিটার, এই ট্রেনিংয়ে এরা উন্নতি করবে! তবে সুহাসের স্ট্রোক নিখুঁত। ক্ষিতীশ বলল, ''কোনি, ওই যে ছেলেটা জলে নামল ওকে লক্ষ করো দেখো কেমনভাবে হাত পাড়ি দেয়।''

কোনি একাগ্র হয়ে তাকিয়ে রইল সুহাসের সাঁতারের দিকে। ক্ষিতীশ এক সময় বলে উঠল, ''হাতটা মাথার ঠিক সামনে জলে ঢুকে সামনে চলে যাচ্ছে, তারপর নীচে নামছে, তারপর টেনে ঊরু পর্যন্ত আনছে। সব থেকে দরকার স্পিডে হাত চালানো। তার মানে এলোপাথাড়ি গঙ্গায় যেভাবে করো তা নয়। সুন্দরভাবে জলে হাতের ঢোকাটা আর শক্ত কবজি খুব দরকার। আসল স্পিডটা আসে কাঁধের, পিঠের আর হাতের মাসলের শক্তি থেকে। এজন্য তোমার একসারসাইজ করতে হবে। এই শক্তিটাকে গুছিয়ে কাজ করালে তবেই স্পিডটা আসবে। মাথাটা কীভাবে রয়েছে দেখেছ? তুমি যেমন এধার ওধার নাড়াও, সেই রকম করছে কি? মুখ জলে ডুবিয়ে কেমন এগোচ্ছে। শুধু নিশ্বাস নেবার জন্য মাথাটা, ওই দ্যাখো পাশে ঘোরাল। বেশি মাথা নাড়ালে স্পিড কমে যায়। কাঁধটা জল থেকে উঠে আছে।''

কোনি শুনছে কি শুনছে না বোঝা গেল না। সাঁতারুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ সে বলল, ''আচ্ছা ওই মেয়েটার নাম কী?''

ক্ষিতীশ একটু হতাশ হয়েই বলল, ''জানি না।''

''ওর কস্ট্যুমটা কীসের, গেঞ্জির?''

''নাইলনের — খুব দামি।''

''খুব সুন্দর রংটা।''

ক্ষিতীশ কী যেন ভেবে নিয়ে বলল, ''তোমাকে কিনে দেবো একটা —''

কোনি ঘুরে দাঁড়াল। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে।

''যেদিন তুমি ওই রকম স্ট্রোক দিতে শিখবে।'' ক্ষিতীশ আঙুল দিয়ে সাঁতরে যাওয়া সুহাসকে দেখাল।

কোনি তীক্ষ্ণ চোখে সুহাসের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, ''দু'দিনে শিখে নেব।''

''ভালো। কাল সকাল ঠিক সাড়ে ছটায় আজ যেখানে দাঁড়িয়েছিলে, সেখানে দাঁড়াবে। কস্ট্যুম সঙ্গে আনবে। পাশ তুমি করে যাবেই সেজন্য ভাবছি না। কিন্তু স্ট্রোক শেখানোর ভার পান্না কি নির্মলের উপর যদি পড়ে তাহলে তো সব মাটি হয়ে যাবে।''

কিন্তু কোনি পাশ করেও ভর্তি হতে পারল না।

সকালে ক্ষিতীশ দাঁড়িয়ে পরীক্ষা নেওয়া দেখল। কোনি অনায়াসে দু'শো মিটার সাঁতরাল, জলে দু-হাতে তুলে রইল, ঝাঁপ দিল ডাইভিং বোর্ডের নীচতলা থেকে।

বিকেলে অফিস ঘরে প্রফুল্ল তাকে বলল, ''সম্ভব নয়, আর মেম্বার নেওয়া যাবে না, সেক্রেটারির স্ট্রিক্ট অর্ডার। জলে আর হাত-পা ছোঁড়ারও জায়গা নেই, এত ভিড়। আজকেই তো দুজনকে রিফিউজ করতে হলো।''

''তাহলে আগেই সেটা আমাকে বলা হলো না কেন?'' ক্ষিতীশ রাগে ফেটে পড়তে গিয়েও সামলে নিল।

''বলার কথাটা মনে ছিল না।''

বন্দুকের নল থেকে বেরিয়ে আসার মতো ক্ষিতীশ ক্লাব থেকে বেরিয়েই দেখল স্টার্টিং প্ল্যাটফর্মে হরিচরণ দাঁড়িয়ে। কথা বলছে দুটি ছেলের সঙ্গে।

''হরিচরণ'' ক্ষিতীশ চিৎকার করে উঠল, ''চিফ ট্রেনার হতে চেয়েছিলিস, হয়েছিস। এরপরও এসব কী হচ্ছে?''

হরিচরণ বিরক্তিভরে ফিরে তাকিয়ে বলল ''কী আবার হচ্ছে?''

''আমার মেয়েটাকে ভর্তি করলি না কেন?''

''প্রফুল্লর কাছে যাও।''

''ওসব ছেঁদো ওজর অনেক শোনা আছে। তবে এই বলে রাখলুম, দেখবি ওই মেয়ে তোদের মুখে চুনকালি দেবে। সেদিন আপোসশ করবি।''

''ওই মেয়ে, যাকে কাল এনেছিলে! ভালো, ভালো, তাই দিক। একটা মেয়ে সুইমার বেঙ্গল পাচ্ছে তাহলে!''

''বেঙ্গল নয়, ইন্ডিয়া পাবে।'' রেলিংয়ে ধরা মুঠোটা শক্ত করে নিজেকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ক্ষিতীশ ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে যেতে লাগল, ''ওলিম্পিকের গুল মেরে সুইমার তৈরি করা যায় না রে, ধরা একদিন পড়বিই।''

প্রফুল্ল ক্লাব থেকে বেরিয়ে এল।

''কী আবোলতাবোল চিৎকার করছ ক্ষিদ্দা।''

''বেশ করছি। কর্পোরেশনের জমিতে আমি দাঁড়িয়ে। তোদের ইতরোমোটা শুধু দেখছি। মেয়েটাকে তোরা ভর্তি করলি না, ভেবেছিস আর বুঝি ক্লাব নেই। পৃথিবীতে শুধু জুপিটারই একমাত্র ক্লাব।''

''তা হলে যাও না অন্য ক্লাবে।'' হরিচরণ চেঁচিয়ে উঠল। ''ওই তো পাশেই একটা ক্লাব রয়েছে।''

''তাই যাব, তাই যাব।''

ক্ষিতীশ হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে গেল অ্যাপোলোর দিকে। পিছনে জমে যাওয়া ভিড়টাকে উদ্দেশ্য করে প্রফুল্ল বলল, ''পাগল মশাই, পাগল।''

অ্যাপোলোর গেটে পৌঁছে সংবিৎ ফিরল ক্ষিতীশের। দাঁড়িয়ে পড়ে নিজের প্রতি অবাক হয়ে ভাবল, এখানে আমি এলাম কেন? এরা তো জুপিটারের শত্রু। আমি কি নেমকহারাম হলাম!

ক্ষিতীশকে দেখতে পেল অ্যাপোলোর অন্যতম ভাইস-প্রেসিডেন্ট নকুল মুখুজ্জে। সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেটের কাছে এসে বলল, ''কী ব্যাপার, ক্ষিতীশ যে! তুই এখানে?''

হঠাৎ ক্ষিতীশের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, ''তোমাদের এখানে জায়গা হবে নকুলদা! জুপিটার আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে।''

''যাঃ কি আজেবাজে বকছিস। তোকে তাড়াবে কে?''

''সত্যি বলছি নকুলদা, তাড়িয়ে দিয়েছে। আমায় টাকা পয়সা দিতে হবে না। একটা মেয়ে পেয়েছি, তাকে শেখাবার সুযোগটুকু দিও তা হলেই হবে।''

''ভেতরে আয়, আগে সব শুনি।''

''তার আগে বলে রাখি, আমি কিন্তু জুপিটারের লোক, অ্যাপোলো কোনোদিনই আমার ক্লাব হবে না।''

''তাহলে তোকে আমরা নেব কেন?''

''আমাকে নয়, মেয়েটাকে নাও। আমি ওকে শেখাব। ও যদি সম্মান আনে তাহলে সেটা হবে অ্যাপোলোর।''

''আচ্ছা আচ্ছা, ভেতরে চল।''

''আগে বলো, আমার শর্তে রাজি! অ্যাপোলোর তুমিই সব, তোমার কথায় ক্লাব ওঠে বসে। তুমি কথা দিলে তবেই ঢুকব।''

নকুল মুখুজ্জে কিছুক্ষণ স্থির চোখে ক্ষিতীশের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, ''তোর জুপিটার থেকে বেরিয়ে আসা মানে আমাদের শত্রুর দুর্গের একটা খিলেন ভেঙে পড়া। অ্যাপোলোর ছাদের নীচে তুই আসিস, সেটাই আমাদের ভিকট্রি হবে। আচ্ছা কথা দিলাম।''

গেট অতিক্রম করার আগে ক্ষিতীশ একবার পিছন ফিরল। কমলদিঘির জলে ছায়া পড়েছে পশ্চিমের দেবদারু আর রাধাচূড়া গাছের। জুপিটারের বিরাট ঘড়িটার কালো ডায়ালে কাঁটা দুটো আবছা লাগল ক্ষিতীশের পুরু লেন্সে। বুকের মধ্যে প্রচণ্ড একটা মোচড় সে অনুভব করল। চিকচিক করে উঠল চোখ দুটো।

সেই রাতে ঘুম এল না ক্ষিতীশের। বারান্দার দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে রাতটা কাটাল। বারবার একটা কথাই তার মনে পাক দিয়ে ফিরল: ''আমি কি ঠিক কাজ করলাম? অ্যাপোলোয় যাওয়া কি উচিত হলো?''

ভেলো উত্তেজিত হয়ে হাজির হলো সকালেই।

''ক্ষিদ্দা, তুমি অ্যাপোলোয় জয়েন করেছ? বেশ করেছ। তোমাকে তো সেই কবে বলেছিলুম, এটা হলো যুদ্ধ। ন্যায়-অন্যায় বলে যুদ্ধে কিছু নেই, শত্রু-মিত্র বাছ-বিচার করে কোনো লাভ নেই।''

ক্ষিতীশ চুপ করে রইল।

''জুপিটারকে এবার শায়েস্তা করা দরকার। বুঝলে ক্ষিদ্দা, তুমি শুধু ওই নাড়ির সম্পর্ক-টম্পর্কগুলো একটু ভুলে যাও ....''

''ভেলো!''

ক্ষিতীশের একটা হাত তোলা। চোয়াল শক্ত। পুরু লেন্সে ভেঙে চোখ দুটো যেন বেরিয়ে আসবে। ভেলো এক পা পিছিয়ে গেল।

''আর একটা কথা যদি বলেছিস তো — ''

ভেলো বিড়বিড় করে বলল, ''আমার ভুল হয়ে গেছে। আমায় মাপ করো ক্ষিদ্দা।''

‘‘না না না, কতবার বলব কনুইটা অতটা ভাঙবে না — হাতটা অমন তক্তার মতো লাফিয়ে উঠল কেন? উহুঁ উহুঁ ... হলো না, বাঁ হাতটা এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে বাঁ কাঁধটাও এগোচ্ছে আর ডান কাঁধটা পিছিয়ে যাচ্ছে, এতে স্কোয়ার শোল্ডার পোজিশানটা যে ভেঙে যাচ্ছে ... নে নে, আবার কর ... ওকি! জলের বাইরে হাত নিয়ে যাবার সময় শরীরের পাশের দিকটা বেঁকে তেউড়ে শুঁয়োপোকা চলার মতো হয়ে যাচ্ছে যে!... দ্যাখ আমাকে দ্যাখ। তোর কনুইটা কেন বাঁক খাচ্ছে না বোঝার চেষ্টা কর ... এইভাবে, এইরকম। আর হাতের আঙুল জল টানবার সময় ফাঁক করবি না। জলের ওপর থাবড়ে থাবড়ে হাত ফেলিস দেখেছি, ওভাবে নয়। পরিষ্কারভাবে সোঁত করে ঢুকে যাবে। আগে আঙুল তারপর কবজি থেকে পুরো হাতটা। আর নিশ্বাস নেওয়াটা ভালো করে বুঝেনে। যদি ডান দিকে মাথা ঘুরিয়ে নিশ্বাস নিস, তাহলে বাঁ হাতটার কবজি যখন জলে ঢুকছে তখন মাথা ঘোরাবি। মাথা নীচু রাখার জন্য থুতনিটা বুকের দিকে টেনে রাখবি। মাথার লাইন এধার ওধার হবে না। ডান হাতটা যখন উঠবে তার তলা দিয়ে উঁকি দেবে হাঁ করে নিশ্বাস নিতে নিতে। আর ডান হাত যেই জলে ঢুকছে সেই সঙ্গে তোর মুখও আবার জলে ডুবছে। ... যা যা আবার কর। দু-হপ্তা হয়ে গেল এখনো একটা জিনিসও ঠিক মতো করতে পারলি না।’’

জলের ধারে সিমেন্ট বাঁধানো সরু পাড়ে দাঁড়িয়ে ক্ষিতীশ সমানে বকবক করে চলেছে। কোনি পাড়ের ধারে খানিকটা সাঁতরায় আর থেমে ওর দিকে তাকায়। সকাল সাড়ে ছ’টা থেকে এই ব্যাপার চলেছে। এখন সাড়ে আটটা।

‘‘আর পাচ্ছি না ক্ষিদ্দা।’’

‘‘কেন! বলেছিলি দু-দিনেই সুহাসের মতো স্ট্রোক শিখে নিবি। দু-দিন ছেড়ে তো সতেরো দিন হয়ে গেল।’’

জলের মধ্যে দাঁড় সাঁতার কাটতে কাটতে কোনি চাপা রাগ নিয়ে বলল, ‘‘করছি তো আমি। আপনি খালি হচ্ছে না হচ্ছে না বলেই যাচ্ছেন।’’

‘‘না হলে কী বলব, হচ্ছে?’’

‘‘হচ্ছেই তো।’’

‘‘কিচ্ছু হয়নি। যা বলছি আবার কর।’’

‘‘আমার ভালো লাগছে না।’’

কোনি পাড়ের দিকে এগিয়ে এল। ক্ষিতীশ কী করবে ভেবে না পেয়ে বলল, ‘‘স্ট্রোক শিখলে কিন্তু নাইলন কস্ট্যুম দেবো।’’

‘‘দরকার নেই আমার।’’

বাঁধানো পাড়ে দু-হাতের ভরে কোনি জল থেকে উঠে এল। ক্ষিতীশ বুঝতে পেরেছে ওকে খাটাতে হলে জোরজবরদস্তিতে কাজ হবে না। কিছু একটা প্রাপ্তি যোগ না থাকলে ওকে উৎসাহিত করা যাবে না।

‘‘উঠে পড়লি যে, ক্ষিদে পেয়েছে?’’

কোনি কথা বলল না। এগিয়ে গেল রেলিংয়ের গেট লক্ষ করে।

‘‘ক্ষিদে তো পাবেই। ভাবছি দুটো ডিম, দুটো কলা আর দুটো টোস্টের ব্যবস্থা করলে কেমন হয়।’’

কোনি দাঁড়িয়ে পড়েছে। ক্ষিতীশ মনে মনে হিসেব করে দেখল, প্রায় এক টাকার ধাক্কা।

‘‘আজ থেকে?’’

ক্ষিতীশ ঘাড় নাড়ল। কোনি কী যেন ভেবে নিয়ে বলল, ‘‘আমি কিন্তু বাড়িতে নিয়ে গিয়ে খাব।’’

ক্ষিতীশ একটু কৌতূহলী হয়েই বলল, ‘‘বাড়িতে কেন!’’

‘‘এমনিই। বাইরে আমি খাব না।’’

‘‘তাহলে আরো একঘণ্টা জলে থাকতে হবে।’’

ক্ষিতীশ কথাটা বলেই মনে মনে ব্যথিত হলো। লোভ দেখিয়ে ক্ষুধায় অবসন্ন কোনিকে আরো পরিশ্রম করানো অমানুষিক কাজ হবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হলো সাধ্যের বাইরে গিয়ে নিজেকে ঠেলে নিয়ে যেতে হবেই, নয়তো কিছুতেই সাধ্যটাকে বাড়ানো যাবে না। খাটুক, আরো খাটুক। যন্ত্রনায় ঝিমঝিম করবে শরীর, টলবে, লুটিয়ে পড়তে চাইবে যন্ত্রণার পাঁচিলের সামনে। আর তখন জেনেশুনেই চ্যালেঞ্জ দিতে হবে ওই পাঁচিলটাকে। এজন্য চরিত্র চাই, গোঁয়ার রোখ্ চাই।

‘‘... নাম নাম, দাঁড়িয়ে আছিস কেন। দুটো ডিম, দুটো কলা, দুটো মাখন টোস্ট।’’

যন্ত্রণা কী জিনিস সেটা শেখ। যন্ত্রণার সঙ্গে পরিচয় না হলে, তাকে ব্যবহার করতে না শিখলে, লড়াই করে তাকে হারাতে না পারলে কোনোদিনই তুই উঠতে পারবি না।

‘‘... ঠিক আছে, ঠিক আছে, কনুই অতটা উঠবে না। মুখ ডুবিয়ে।’’

যন্ত্রণা আর সময় তোর অপোনেন্ট। ও দুটোকে আলাদা করা যায় না। যন্ত্রণাকে হারালে সময়কেও হারাতে পারবি। সময়কে হারালে পারবি যন্ত্রণাকে হারাতে।

রেলিংয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষিতীশ মনে মনে কোনির সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছে আর মাঝে মাঝে চিৎকার করে উঠছে। কমলদিঘিতে এখন সাঁতার কাটছে একমাত্র কোনি। মাঝখানের চওড়া ঘাটে তিনচারজন বাইরের লোক স্নান করছে। বাসন ধুচ্ছে একটি স্ত্রীলোক। জুপিটার এবং অ্যাপোলোর নম্বর খোলা স্টার্টিং প্ল্যাটফর্মগুলো পাশাপাশি প্রায় পঞ্চাশ মিটারের ব্যবধানে। সেগুলো এখন জনশূন্য। শুধু জুপিটারের স্প্রিং বোর্ড থেকে ঝাঁপ দিয়ে যাচ্ছে গোটাচারেক উটকো বাচ্চা ছেলে। জুপিটারের ক্লাবের বারান্দায় বেঞ্চে বসে দুটি লোক তেলে ভাজা খেতে খেতে গল্প করছে আর হাসাহাসি করছে ক্ষিতীশের দিকে তাকিয়ে।

অ্যাপোলো ক্লাবের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল অমিয়া আর বেলা। কোনির সাঁতার দেখতে তারা রেলিংয়ের ধারে দাঁড়ায়। অমিয়া দিন সাতেক পর আজ জলে নেমেছিল। কলেজের পরীক্ষার জন্য সে ব্যস্ত। অমিয়া না থাকলে বেলা নাকি ট্রেনিংয়ে জুত পায় না। দুজনে আজ আধ মাইল করে সাঁতরেছে।

‘‘কে রে মেয়েটা?’’ অমিয়া জিজ্ঞাসা করল।

‘‘ক্ষিদ্দার আবিষ্কার।’’ বেলা চোখ পাকিয়ে বলল, ‘‘শুনিসনি, হরিচরণদা কী বলছিল সেদিন? ক্ষিদ্দা নাকি প্রতিজ্ঞা করেছে জুপিটারকে ডাউন দেবে ওই মেয়েটাকে দিয়ে।’’

‘‘সে কিরে, ও তো এখনো হাতের টান দিতেই শেখেনি। সামনের বছরই আমি কিন্তু জুপিটারে ফিরে যাব। যেখানে ক্ষিদ্দা আছে সেখানে আমি নেই। পাঁচজনের সামনে ট্যাঁকোস ট্যাঁকোস করে কথা শোনাবে, ও আমার সহ্য হয় না।’’

‘‘আমিও তাহলে যাব।’’

দুজনে আর একবার কোনির দিকে তাকিয়ে হাঁটতে শুরু করল। তখন অমিয়া হেসে বলল, ‘‘কম্পিটিশনে পড়লে মেয়েটা তো আমার পা ধোয়া জল খাবে।’’

প্রায় পৌনে দশটা। বাজার নিয়ে ফিরতে আজ দেরি হবেই। ক্ষিতীশ ব্যস্ত হয়ে হাঁটছে, পিছনে কোনি। একটা অস্টিন ফুটপাথ ঘেঁষে ক্ষিতীশের পাশে দাঁড়াল। জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল বিষ্টু ধরের মুখ।

“ও ক্ষিতীশবাবু, আপনাকেই খুঁজছি যে। যে ইস্পিচটা লিখে দিলেন সেটা কেমন যেন ঠিক বাগে আনতে পাচ্ছি না, একটু ডিসকাসন করলে ভালো হতো। আজকেই তো বিকেলে সভা।”

“কিন্তু আমার যে এখুনি বাজার করে বাড়ি পৌঁছাতে হবে।”

“গাড়িতে উঠুন। বাজার সেরে গাড়িতেই পৌঁছে দিয়ে ডিসকাসটা করে ফেলব।”

বিষ্টু ধর মোটরের দরজা খুলে দিল। ব্যস্ত হয়ে ক্ষিতীশ গাড়িতে উঠছে, তখন জামায় টান পড়ল।

“খাবারের কী হবে!”

“ওহ্ তোর ডিম-কলা।” ক্ষিতীশ বিব্রত হয়ে, কী বলবে ভেবে পেল না।

“আমাকে বরং পয়সাটা দিয়ে দিন, কিনে নেব।”

কথা না বলে ক্ষিতীশ পকেট থেকে একটা টাকা বার করে কোনির হাতে দিয়ে বলল, “বিকেলে ঠিক সময়ে আসিস।”

গাড়ি চলতে শুরু করলে বিষ্টু ধর জিজ্ঞাসা করল, “কে মেয়েটা?”

“আমার ভবিষ্যৎ।” ক্ষিতীশ হেসে বলল।

লীলাবতী যথারীতি তালা দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

ক্ষিতীশ রান্নার উদ্যোগ না করে বিষ্টু ধরকে নিয়ে বারান্দায় বসল। বিশু আর খুশি এগিয়ে এল ক্ষিতীশকে দেখে। বিষ্টু কুঁকড়ে গিয়ে বলল, “ও দুটোকে সরান। দেখলে গা শিরশির করে।”